জাপান।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক
চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
কুন্তলীন প্রেস,
৬১, ৬২নং, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

[মূল্য ১॥০ মাত্র।

"এস, মানুষ হও। তোমাদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে একবার বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। দেখ জাতিসমূহ কেমন এগিয়ে চলেছে। তুমি কি মানুষ ভালবাস? তুমি কি তোমার দেশকে ভালবাস? তবে এস আমরা উচ্চতর ও মহত্তর কার্য্যের জন্য যত্নবান হই। পিছনে দেখোনা—না, নিকটতম ও প্রিয়তমেরা কাঁদিলেও না,—পশ্চাতে দেখো না, এগিয়ে চল।"

বিবেকানন্দ (অনুবাদ)

ভূমিকা

আমাদের দেশে জাপান সম্বন্ধে সঠীক খবর জানিবার অনেকেরই ইচ্ছা আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙলা ভাষায় জাপান সম্বন্ধে একখানিও উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচিত হয় নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য বর্ত্তমান পুস্তকের অবতারণা। আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বঙ্গসন্তান জাপানে অবস্থান করিলেও, অতি অল্পলোকেই জাপানের বিষয় লিখে থাকেন।

মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকাদিতে জাপান সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হয়, প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানে কখনও পদার্পণ করেন নাই, সেহেতু তাঁদের স্থানগত অভিজ্ঞতা না থাকাতে প্রবন্ধগুলি অনেক সময় ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ হইয়া থাকে। লেখা অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট হয়। ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম, "কলের স্ত্রী অথবা পুরুষ মজুরদিগের পোষাকের নাম 'কিমনো।' এই পোষাক শরীরে বিলক্ষণ দৃঢ় সংলগ্ন থাকে। ইহাতে পরিধেয় বস্ত্রাদি কলে গুটাইয়া যাইবার ভয় থাকে না।" প্রথমত কথাটা 'কিমনো' নয়, 'কিমোনো।' আমাদের ভাষায় যাহা 'পোষাক' জাপানী ভাষাতে তাকেই 'কিমোনো' বলে। উহা 'কলের স্ত্রী অথবা পুরুষ মজুরদিগের' বিশেষ পোষাকের নাম নয়। 'এই পোষাক শরীরে বিলক্ষণ দৃঢ়সংলগ্ন থাকে' না, বরং তাহার বিপরীত। সেই জন্য কলে কাজ করিবার সময় জাপানী মজুরেরা কিমোনো পরে না, আঁটা পায়জামা পরে।

কোনো জাতিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হয়। তবেই জাতির বিশেষ গুণ ও দোষ আমরা দেখিতে পাই। সার্দ্ধ চারি বৎসর কাল জাপানে

থাকিয়া অনেক ভদ্র পরিবারের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, ও সেই ক্ষেত্রে তাঁদের পারিবারিক জীবন অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হইয়াছিল। এবং ঐ সময় তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে অবস্থান কালে জাপানী ছাত্র চরিত্রও বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছি।

এ পুস্তক প্রণয়নে আর্থার লয়েড লিখিত 'এভ্রি ডে জেপ্যান' নামক ইংরাজি পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। জাপানী রমণীদের বিষয়ে অনেক কথা আমার জাপানী মহিলা বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছি, তজ্জন্য তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার চেষ্টা সামান্য হইলেও আন্তরিক। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সেতু-বন্ধনরূপ বৃহৎ কার্য্যে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালির সাহায্যও প্রত্যাখ্যান করেন নি, তাই আশা আছে বঙ্গভাষারূপ সেতুবন্ধনে আমার সাহায্যের চেষ্টা সুধীগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইবে না।

পূজ্যপাদ পিতাঠাকুরের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইত না, তজ্জন্য তাঁহার নিকট যে আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ তাহা বলাই বাহুল্য।

বেথুন ইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাস মহাশয় প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকের মলাট জাপানের জাতীয় রঙ (National colours) শ্বেত ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। মলাটের মধ্যভাগে জাপানের "উদীয়মান সূর্য্য।"

কলিকাতা,
১লা আশ্বিন, ১৩১৭। } সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী।

চিত্র সূচী।

জাপান।

সমুদ্রে।

অনেকদিন পরে আমার জীবনের একটা সাধ পূর্ণ হতে চলিল। যে দিন আমার জাপানে যাওয়া স্থির হ'ল সে দিন থেকে একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে মনটা ভ'রে গেছে। যাত্রার পূর্ব্বের কয়েকটা দিন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে, ভবিষ্যৎ জীবনের আলোচনায়, জিনিষপত্র গুছিয়ে ও আত্মীয়স্বজনের বাটীতে ভোজ খেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল। তারপর যে দিন যাত্রা করব, সে দিন মধ্যাহ্নে মাতাঠাকুরাণী আমার কাছে বসে আমাকে আহার করাচ্ছিলেন। তাঁর বিষাদপূর্ণ নীরব দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে তাঁর গত উনিষ বৎসরের স্নেহ-মমতা-ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আজ মাতার ভালবাসার বেষ্টন হতে দূরে যাবার দিন চোখ দুটো অজ্ঞাতসারে জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে দিন আহারের সময় বিশেষ কথাবার্ত্তা হ'ল না। আসন্ন সুখ, দুঃখ বা বিচ্ছেদের সময় বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না।

তখন কলিকাতায় সবে একটু একটু শীতল বাতাস বইতে আরম্ভ হয়েছে। বৈকালে চারিটার মধ্যে জাহাজে উঠ্‌তে হবে। জাহাজ পরদিন প্রাতে ছাড়্‌বে, কিন্তু যাত্রীদিগকে চারিটার মধ্যে ডাক্তারের পরীক্ষার

পর জাহাজে উঠ্‌তে হবে। তারপর আর কোনও যাত্রীকে তীরে নাম্‌তে দেওয়া হবে'না। অনেক দিনের জন্য প্রবাসে যাবার সময় মনে হয় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্মীয়স্বজনের কাছে কাছে থাকি। বিচ্ছেদ যখন ক্রমশই নিকটে আস্‌তে থাকে, তখন যেন বন্ধুবান্ধবের সহিত, যাদের ভালবাসি তাদের সহিত, এতদিন যেন ঠিক্‌মত ব্যবহার করি নি, যতটা ভালবাসা উচিত ছিল ততটা ভালবাসিনি, এই চিন্তা মনটাকে আকুল করিয়া তোলে। তাই ষ্টীমার কোম্পানির এই ব্যবস্থা, এই যে সমস্ত রাত্রি ডাঙার কাছে থেকেও তীরে নেমে আর একবার স্নেহ ভালবাসার পাত্রদিগের সহিত দেখা করতে পারবে না, আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন থেকেও জলপান করতে পারবে না, বড়ই ক্রূর ব'লে বোধ হ'ল।

বৈকালে ষ্টীমার ঘাটে অনেকেই এসেছিলেন। ডাক্তারের পরীক্ষার পর বন্ধুবান্ধবদের নিকট শেষ বিদায় নিয়ে মা ও দিদি যে গাড়িতে ছিলেন সেখানে গেলুম। বুঝ্‌লুম তাঁরা কাঁদ্‌চেন, তাই প্রবোধ দিবার জন্য বল্‌লুম কাঁদ কেন? শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব। বল্‌তে বল্‌তে আমারও কণ্ঠরোধ হয়ে এল, ভয় হ'ল পাছে আমিও কেঁদে ফেলি তাই তাঁদের মুখের দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে চলে এলুম।

ষ্টীমারে উঠে দেখি একটা ছোট ঘর আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। লোকজন তখন মাল উঠাচ্চে, ছুটাছুটি কর্‌চে কোন বিধি ব্যবস্থা নাই। সর্ব্বত্রই গণ্ডগোল। আমার মনটাও তখন কেমন হয়ে গেছে। সুখও নয়, দুঃখও নয়, কেমন একটা মাঝামাঝি অবস্থা। কোথায় যাচ্চি, কেন যাচ্চি, কি হবে ইত্যাদি চিন্তা মনে উঠ্‌ছিল না। একটা চুব্‌ড়িতে মা তাঁর স্নেহ হস্তে ফল ও সন্দেশ সাজিয়ে দিয়েছিলেন, তারও কিছু খাবার ইচ্ছা

হ'ল না। তাই চুপচাপ্ করে, বাহিরের অবস্থার সঙ্গে আমার যেন কোন সংশ্রব নেই, যা হয় হোক্‌গে, এই ভাবে ষ্টীমারের সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনে বসে রইলুম।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। বৈদ্যুতিক আলোকে জাহাজ আলোকিত হয়ে উঠ্‌ল। লোকজন পূর্ব্ববৎ ছুটাছুটি কচ্ছিল। একটা চীনা বয় "ট্রে"তে আমার সন্ধ্যার আহার নিয়ে এল। খাবার চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু কিছুই খেতে পার্‌লুম না, আহারে একেবারেই অভিরুচি ছিল না। বিছানার আশ্রয় নিলুম। দেশ ছেড়ে নূতন দেশে যাচ্চি একথা ভেবে একটা বেশ আনন্দ পাচ্ছিলুম। আমি যে একলা, বিদেশ যাচ্চি, আমার সঙ্গে কেউ নেই, বিদেশে গিয়ে নিজেই নিজের তত্ত্বাবধান কর্‌ব, আমার শক্তির উপর মাতাপিতা যে এতবড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করেচেন, এ ভেবে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। ভবিষ্যৎ চিন্তার আনন্দ সময় সময় বর্ত্তমান বিচ্ছেদের দুঃখকে অতিক্রম করে উঠ্‌ছিল।

কতক্ষণ চিন্তা করেছিলুম জানিনা, হঠাৎ দুয়ারে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে চম্‌কে উঠ্‌লুম। দুয়ার খুলে দেখি এক বাঙালী বাবু। পরিধানে অর্দ্ধ মলিন বস্ত্র, গায়ে সার্টের উপর একখানা জীর্ণ আলোয়ান, রংটা প্রথমে নীল ছিল, অনেক দিনের ব্যবহারে এখন ধূসরে পরিণত হয়েচে। বাবুটির বয়স অনুমান আটাশ হতে ত্রিশের মধ্যে। ইতি মধ্যেই মুখে বার্দ্ধক্যের রেখা পরিস্ফুট। তার জীবনযাত্রা, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই মত, স্বচ্ছল নয় বুঝতে পার্‌লুম। বাবুটিকে আমার আরাম কেদারায় ব'সতে ব'লে আমি বিছানায় শুয়ে রইলুম। কথাবার্ত্তা হ'লে জান্‌লুম তিনি কোন ইংরাজ বণিকের আফিসে কাজ করেন, মাল উঠিয়ে দিয়ে আবার রাত্রেই

নেমে যাবেন। তিনি আবার নেমে যাবেন শুনে মন আবার বাড়ী মুখে ধাবিত হ'ল। মনে হ'ল ইনি ত বড় সৌভাগ্যবান্, আমি ত নাম্‌তে পারি না। জাহাজখানা যদিও তীরের কাছে দাঁড়িয়েছিল, তবুও ইতিমধ্যে সেটা যেন আমার কাছে বিদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বাটীর এত নিকটে থেকেও যেন কত দূরে! বাবুটির জন্য কেমন একটা স্নেহানুভব করতে লাগলুম। তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, ইত্যাদি। আমিও যথাসম্ভব উত্তর দিলুম। তিনি যে সব কথা বুঝলেন এমন বোধ হলনা, লোকটির বিশেষ শিক্ষা ছিলনা। হঠাৎ বিছানার তলায় চুবড়ির দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও চুবড়িতে কি? আমি বল্লুম মা কতকগুলা সন্দেশ ও ফল দিয়েছেন, আপনি কিছু খাবেন কি? ব'লে কয়েকটা সন্দেশ ও ফল তাঁকে দিলুম। তিনি খুব তৃপ্তিপূর্ব্বক খেতে লাগ্‌লেন দেখে লজ্জিত হয়ে উঠলুম, ভাবলুম আগেই দেওয়া উচিত ছিল।

অকেনক্ষণ কেটে গেল, বাহিরে কপিকলের ঘড়ঘড়ানি, মালপতনের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ ও কুলিদের চীৎকারে ঘুমান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মধ্যে একটু তন্দ্রা এসেছিল, চোখ মেলে দেখি বাবুটি চলে গেছেন। বৈকালে বাবা বলে গিয়েছিলেন ভোরবেলায় জাহাজ ছাড়বার আগে আমার ছোট দুই ভাইকে নিয়ে জেটির উপর আসবেন। আমাকে সেই সময়ে ডেকের উপর থাকতে বলেছিলেন, তাই মনে মনে স্থির করলুম খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে।

নানা কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙলে দেখি জানালার ভিতর দিয়ে ভোরের আলো একটু একটু আসচে। কপি-

কলের শব্দ, কুলিদের গোলমাল সব থেমে গেছে, তার জায়গায় কেমন একটা মৃদু গম্ভীর আওয়াজ হচ্চে। আমি ত লাফিয়ে উঠ্‌লুম, হঠাৎ গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে দেখি জেটিও নেই, হাইকোর্ট্‌ও নেই অনেকটা গঙ্গার ঘোলা জল দেখা গেল। অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ছুটে ডেকের উপর উঠলুম, যা ভয় করেছিলুম তাই, জাহাজ প্রায় আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে দিয়েচে। গঙ্গার উপর দিয়ে, ঠাণ্ডা বাতাস দূরাগত বিরাট্ দীর্ঘনিশ্বাসের মত ডেকের উপরে উঠে আবার অন্যদিকে গঙ্গার জলে মিলিয়ে গেল। দুঃখে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সমস্ত রাত্রিই ত জেগে ছিলুম, কেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌লুম! দেশত্যাগের আগে একবার দেশের দিকে চাইতে পারলুম না! বোধ হতে লাগ্‌ল—বাবা আর আমার ছোট দুটি ভাই জেটির উপর দাঁড়িয়ে আছেন, ডেকে আমাকে না দেখতে পেয়ে হয়ত এই আসি এই আসি করে অপেক্ষা ক'চ্চেন; তারপর ক্রমশঃ জাহাজের 'ফানেল' থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগ্‌ল, আমি তখনো আসিনা দেখে চেঁচিয়ে ডাক্‌লেন, তার পর সত্যসত্যই জাহাজ ছেড়েদিল, তখনো তাঁরা জাহাজের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর জাহাজ চলে গেল দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ী চলে গেলেন!

আমি জাহাজের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, নিজের উপর বড় ধিক্কার হ'ল; বুক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগ্‌ল, তারপর চোখ দিয়ে ধারা বয়ে গেল। বারে বারে কেবল ছোট দুটি ভাইয়ের কথা মনে হতে লাগ্‌ল, তারা যে বলে গিয়েছিল, 'দাদা, আবার কাল আস্‌ব'। রাত্রে হয়ত ঘুমোয় নি, ভোরের বেলা ছুটোছুটি করে এসেছিল, এসেও দেখা পায়নি। আমি তাঁদের শিশু-হৃদয়ে বড়ই বেদনা দিয়েছি,

হয়ত তারা ভেবেচে, দাদা আমাদের কথা ভাবেনি তাই ঘুমিয়ে পড়েচে। এ কথাটা যে সত্য নয়, আমি যে তাদের কথা সারা রাত ভেবেচি এ বুঝিয়ে বল্‌বারও লোক নেই দেখে আমার উপর যেন ঘোর অবিচার হচ্চে মনে হ'ল! গঙ্গাস্রোতের মৃদুতান কেমন যেন বেতালা বেসুরো হয়ে উঠ্‌ল।

সে দিন সমস্তক্ষণ জাহাজ চল্‌ল। নদী ক্রমশই প্রশস্ত হতে লাগ্‌ল, অবশেষে এপার ওপার দেখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। দিনের বেলায় নদীর দুধারে যে সব ছোট ছোট মেটে ঘাট ও কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যাগমে সেগুলিও অদৃশ্য হ'ল। মেটে ঘাটে কখন জলাহরণাগতা বঙ্গরমণী কলসীকক্ষে বিস্মিত নয়নে জাহাজের দিকে দেখ্‌ছিলেন। সে দৃশ্য কি সুন্দর! ভারতের শান্তিভরা গ্রাম্যজীবন!

জাহাজ রাত্রে নঙ্গর করে রইল। পরদিন প্রাতে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সকলে বল্‌লেন আজ বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে সাগরে পৌঁছিব। সাগর কখন দেখিনি, ছেলেবেলায় সাগরের বর্ণনা শুনে বড়ই অসম্ভব ব'লে বোধ হত। সাগরের এপার ওপার নেই কেবলই জল, সে আবার কি রকম? তাও কি সম্ভব? সাগর দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগলুম, বেলা ১০টার সময় নদী এত প্রশস্ত হ'ল, দেখে ভাবলুম বোধ হয় এইটেই সমুদ্র। জিজ্ঞাসা করে জানলুম তা নয়। প্রায় বেলা বারটার সময় দূরে একটা নীল দাগ দেখা গেল, যেন জলের উপর কে একটা নীল দাগ টেনে দিয়েচে, সকলে বল্‌লেন ঐটেই সমুদ্র। জাহাজ অগ্রসর হতে লাগ্‌ল, নীল রেখাটাও ক্রমশ স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌ল। তারপর আরও কাছে এসে

দেখি, জল, জল, অসীম নীল জল বিপুল গর্জ্জনে নদীজলের উপর এসে পড়চে, কিন্তু কিছুতেই মিশ্ খাচ্চে না। সে জলের যেন আদি নেই, অন্ত নেই, এপার ওপার নেই। জলের বিপুলতা আমাকে স্তব্ধ করে দিল, নীলজল ও নীলাকাশে মিশে একটা নীল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হ'ল। সূর্য্যদেব জলাকাশ আলোকিত করে অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত; কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজখানা স্থানভ্রষ্ট হয়ে বেজায়গায় এসে পড়েছে! ভগবানের বিপুল সৃষ্টির মাঝে মানবহস্তে নির্ম্মিত বিরাট্ বস্তুও খর্ব্ব হয়ে যায়।

নীল সমুদ্রে জাহাজ ভাস্‌ল, আমার কতদিনকার সাধ মিট্‌ল। জাহাজ খানা নাচতে নাচতে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। ঢেউয়ের পিছনে ঢেউ, তার পিছনে ঢেউ তার পিছনে আবার ঢেউ। সকলেই ছুটেচে, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, পাগলের মত ছুটেচে। মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘর্ষে সাদা ফেণা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়চে, নানা রকম পাখী ঢেউয়ের উপর দিয়ে উড়চে ও মধ্যে মধ্যে ছোঁ মেরে মাছ ধ'রে খাচ্চে। মধ্যে মধ্যে যখনি দু একখানা কলিকাতাগামী জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তখনই বাটীর কথা ও প্রিয়জনদের কথা মানসচক্ষে ভেসে উঠ্‌ছিল। মনে হচ্ছিল ওরা ত বাটী অভিমুখে যাচ্চে, না জানি ওদের কত আনন্দ। আমার অবস্থা ঠিক বিপরীত; আমি চলেছি প্রবাসে, অচেনা অজানা দেশে!

এখন হতে জাহাজ দিন্‌রাত চলেচে। এইবার জাহাজের সহযাত্রীদের কথা কিছু লিখি। লিখিবার বিশেষ কিছু নেই, যেহেতু অধিকাংশ আরোহীই চীনা, তাদের সঙ্গে মিশিবার সুবিধা হয় নি। যে দিন জাহাজ

ছাড়্‌ল, সে দিন ডেকের উপর ছুটে এসে যখন নিতান্ত নিরাশ হয়ে গেছি তখন দেখি ডেকের এক কোনে রেলিং ধরে এক শ্বেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁরদিকে অগ্রসর হলুম, তিনি অভিবাদন কল্লেন। তাঁর একটা অর্দ্ধমলিন খাকি পোষাক পরা। কথাবার্ত্তায় বুঝলুম অবস্থা তত ভাল নয় তাই ডেকের আরোহী। খাওয়ার জন্য কিছু অধিক দেন ও রাত্রে ডেকের উপর একটা ক্যাম্প্‌ খাটে শুয়ে থাকেন। আমি ও "পায়রার খোপে" মোটেই থাক্‌তে না পেরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ডেকের উপরে থাক্‌তুম। "শ্বেত" বন্ধুটি ইংরাজি বেশ বলতেন, তাঁকে ইহুদি বল্লেই বোধ হয়েছিল। একটি চীনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কলিকাতায় বেন্টিক্‌ ষ্ট্রীটে তাঁর কাঠের দ্রব্যাদির কারখানা। বেশ অবস্থাপন্ন। সঙ্গে ভাল ভাল বিস্কিট্‌ ও নানা রকম চুরট এনেছিলেন। চীনা কর্ম্মচারীদের খুব খাওয়াতেন। দুঃখের বিষয় আমি চুরট খেতুম না, তবে বিস্কিট্‌ গুলার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়িনি। ইনি ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিতেন, pidgin English—পিজিন ইংলিশে। একটা গ্রামোফোন্‌ সঙ্গে এনেছিলেন দিনরাত তাতে চীনে গান বাজাতেন। গান গুলোর অর্থ বুঝতে পারতুম না, সুর বড়ই করুণ, শুনলেই বাড়ীর কথা মনে পড়ে গিয়ে কান্না পেত। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন জনে নানারকম গল্পগুজব করতুম। "শ্বেত" বন্ধুটি অনেক গল্প বলতেন, তার বেশীর ভাগই আজগবি ধরণের,—সময় কাটাবার বেশ উপযোগী।

কলিকাতা ছাড়বার পর চতুর্থ দিনে সকাল ৯½টার সময় দূরে আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ দেখা গেল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আমাদের জাহাজ খুব কাছ দিয়ে গেল। দ্বীপের উপর অনেক গাছপালা ও পাহাড়

দেখলুম। কোন লোকজন দেখা যায় কিনা দেখবার জন্য চেষ্টা করে-ছিলুম কিন্তু দেখতে পাইনি। কত হতভাগ্যের তপ্তশ্বাসে এস্থান পূর্ণ! ক্ষণিক উত্তেজনার বশে কৃতকর্ম্মের জন্য হয়ত কত বৎসর পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধুর বুক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই নিরানন্দ দূরদেশে কাটাচ্চে! হয়ত দেশে ফিরে প্রিয়জনদের দেখতে পাবে না, দীর্ঘকালের পর এসে দেখবে বাড়ী শ্মশানতুল্য হয়েচে! আমাদের জাহাজের ধোঁয়া দেখে হয়ত জাহাজে উঠে বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেচে, মনে কত অনুতাপ কত পূর্ব্বস্মৃতি জেগেছে! এখন থেকে আমার দৈনিক রোজ্‌নামা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্চি।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯০৬। সকাল ৮টার সময় মালয় পর্ব্বতপুঞ্জের কাছ দিয়ে জাহাজ গেল। "শ্বেত" বন্ধুটির একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল। তা দিয়ে পাহাড়গুলি বেশ দেখা গেল। সে দিন রাত্রে জাহাজ পিনাঙে পৌঁছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই কখন পৌঁছিল বুঝ্‌তে পারি নি।

১৫ই ডিসেম্বর। সকালে উঠেই দেখি খুব কাছে পিনাঙ্‌ দেখা যাচ্চে। জাহাজ দাঁড়িয়ে। জাহাজের চারিদিকে ছোট ছোট নৌকা এসে দাঁড়িয়েচে। ঐ নৌকাগুলির একটা বিশেষত্ব—একজন মাঝি। দাঁড়িয়ে সে দুহাতে দু'খানা দাঁড় বাইচে, কোন কষ্ট নেই। এ ক'দিন কেবল জল দেখে কেমন একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, তাই জমি দেখে মন্‌টা নেচে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ করে পিনাঙ্‌ দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। চীনা বন্ধুটিও বল্লেন একসঙ্গে যাবেন। ভালই হ'ল। তিনি পোষাক পরতে গেলেন, আমি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে যখন পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখন আর

তাঁকে চীনা ব'লে চেনে কার সাধ্য! পরিষ্কার ইংরাজি পরিচ্ছদ পরা, মাথায় সে টিকির কোন চিহ্নই নেই, তৎপরিবর্ত্তে সুন্দর টেরিকাটা কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ। সোনার চশ্‌মা, হাতে ছড়ি। আমি অবাক হয়ে গেছি দেখে বল্লেন, চুলটা পরচুলো—wig। কলিকাতার কোন্ বিখ্যাত ইংরাজের দোকানে কিনেছিলেন ও কত দাম তাও বলেছিলেন কিন্তু ডায়েরীতে তার কোনও উল্লেখ নেই। বল্লেন,—চীনা বেশে গেলে সম্মান নেই, তাই পুরো সাহেব সেজেছি। হায় বিড়ম্বনা!

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম, এ পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঘোর নীল ছিল কিন্তু এখানে সবুজ। সবুজ জল দেখে বোঝা যায় জমি নিকট। জলে গাছের পাতা ও অন্যান্য উদ্ভিদ ভাসচে দেখলুম। গভীর সমুদ্রে এরূপ দেখা যায় না। একখানা নৌকা ভাড়া করে তীরে গিয়ে উঠ্‌লুম। কথাবার্ত্তা ত বোঝাবার জো নেই তাই ইসারায় সারতে হ'ল। চীনা ভাষা ইংরাজি—অবশ্য পিজিন-ইংরাজি ছাড়া আর কিছু বলেনই না। পাছে prestige নষ্ট হয়! যা হোক্ লোকটির অন্তঃকরণটা ভাল ছিল। ডাঙ্গায় উঠে জীবনে প্রথম রিক্‌স বা মানুষটানা গাড়ী চড়লুম। একখানা গাড়ীতে দুজনেই চড়লুম। গাড়ীওয়ালা খর্ব্বকায় মালয়বাসী, গায়ে অসীম জোর। আমাদের দুজনকে নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ঘোঁড়ার মত ছুটে বেড়াল। প্রায় সব গাড়ীগুলোই দেখলুম দুজন আরোহী চড়বার উপযুক্ত।

সহরের একটি পল্লিতে অনেক চীনার বাস। দোকানঘর অনেক দেখলুম। এ পল্লিটি বড়ই অপরিষ্কার। আর এক অংশ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শান্তিময় ব'লে বোধ হ'ল। ছোট ছোট বাঙ্‌লো, সামনে ফুলের গাছ, একটুখানি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড। কোন কোন বাটীর

সম্মুখে "টেনিস্ কোর্ট্"। এ অঞ্চলে য়ুরোপীয়ানদের বাস। এঁরা কেমন করে থাক্‌তে হয় তা জানেন, তাই যে দেশেই হোক না কেন য়ুরোপীয়ান পাল্ল সর্ব্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি টেনিসের বড়ই ভক্ত তাই এ পথে যাবার সময় একটু খেলিবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

একটা কথা বল্‌তে ভুল হয়ে গেছে। তীরে উঠেই ডাকঘরে গিয়ে বাটীতে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। কদিন মাত্র বাটী ছেড়ে মনে হচ্ছিল যেন বাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ কতকটা শিথিল হয়ে গেছে, তাই চিঠিখানা পাঠিয়ে পূর্ব্ব-সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল মনে করে বেশ একটু আনন্দানুভব করলুম। ডাকঘরটি ঠিক সমুদ্রের ধারে; এইরূপই হওয়া উচিত, কারণ তীরে নেমে বৈদেশিকের প্রথম কার্য্যই হচ্ছে চিঠি পাঠান। প্রত্যেক বন্দরেই এইরূপ।

পিনাঙে দর্শনীয় স্থান নাই বলিলেই হয়। বটানিক্যাল গার্ডেন্ ও জলপ্রপাত উল্লেখযোগ্য, সহর থেকে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। গার্ডেনের চারিধারে পাহাড়। বেশ নির্জ্জন স্থান, কেবল জলের শব্দ শ্রুত হয়। বাগানে নানা জাতীয় গাছ। পথগুলি উঁচু নীচু, পার্ব্বত্য। ক্রমশ উচ্চতর হয়ে জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছেচে। জলপ্রপাতটি খুব যে বড় তা নয়, দার্‌জিলিং যাবার পথে কয়েকটি এরূপ প্রপাত দৃষ্ট হয়। তবে এ স্থানের দৃশ্যটি বড় মনোরম।

পিনাঙে কাঁঠালের মত একপ্রকার ফল পাওয়া যায়। নাম "ঢুরিয়ন।" আস্বাদ কেমন জানি না, কারণ মুখে দেবার পূর্ব্বেই জঘন্য গন্ধে বমনেচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, অন্তত আমার ত হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোন "সাহসী" লোক আস্বাদ করে জানালে বাধিত হব।

দু'ঘণ্টা পরে তীরে ফিরে এলুম। রৌদ্র খুব প্রখর ছিল। নিকট-বর্ত্তী একটি ভোজনালয়ে কিছু শীতল পানীয় পান করে কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হওয়া গেল।

জাহাজে এসে শুনলুম আমাদের অবর্ত্তমানে সিঙাপুর থেকে কয়েকটি মুসলমান ভদ্রলোক আমার খোঁজে এসেছিলেন। তাঁদের সিঙাপুরে কারবার আছে। কলিকাতাস্থ জনৈক বন্ধু আমাকে পরিচিত করে দেবার জন্য তাঁদের কাছে একখানা পত্র পাঠিয়েছিলেন। কার্য্য গতিকে ইঁহাদিগকে কলিকাতা যাইতে হওয়াতে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখা না হওয়াতে একটু দুঃখিত হলুম।

বেলা সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ নঙর তুলিল।

পরদিন সমস্তদিন মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ দেখা গেল। "শ্বেত" বন্ধুটির দূরবিন্ দিয়ে ভাল করে দেখলুম।

১৭ই ডিসেম্বর। আজ রবিবার। দ্বিপ্রহরের আগেই জাহাজ সিঙাপুর পৌঁছিবে। প্রাতঃকালে উঠে দেখি "শ্বেত" বন্ধুটি তাঁর মলিন খাকি পোষাকটি বদ্‌লে একটি কৃষ্ণবর্ণ "স্যুট" পরেচেন। তাঁকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। তিনি সিঙাপুরে নামবেন। এ ক'দিন আমাদের অনেক রকম গল্প বলতেন, আর তাঁকেই জাহাজে উঠে প্রথম দেখি। লোকটির উপর কেমন একটা স্নেহ জন্মেছিল তাই যখন বিদায় চাইলেন তখন কষ্ট হতে লাগ্‌ল। এই দু'দিন আগে তাঁকে জানতুম না, আর কখন দেখা হবে ব'লে বিশ্বাস নেই। যেখানেই মানুষ যাক্ না কেন মায়া তার পিছনে পিছনে যায়। তাকে পশ্চাতে ফেলে যাবার যো নেই।

জাহাজ জেটিতে সংলগ্ন হবার আগে একখানা ছোট নৌকায় একজন ইংরাজ ডাক্তার এলেন। ডেকের যাত্রীদের সারি দিয়ে দাঁড় করান হ'ল, তারপর প্রত্যেকের নাড়ি টিপে ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখি তাদের মধ্যে অনেককে একটা বড় নৌকায় চড়িয়ে নিকটবর্ত্তী একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে নাকি তাদের কয়েকদিন রেখে দেওয়া হবে। কলিকাতা থেকে কোন রকম সংক্রামক রোগ যা'তে সিঙাপুরে নীত না হয় সে জন্য এরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। আমাদের পরীক্ষা করলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন আছ?"

জেটিতে যখন জাহাজ লাগ্‌ল তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। কলিকাতায় শীত, এখানে কিন্তু ভীষণ গরম। স্থানটি বিষুবরেখার অতি নিকটে অবস্থিত ব'লে এখানে বারমাসই গ্রীষ্ম। প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়ে থাকে। কলিকাতা থেকে চিঠি পেয়ে একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে তাঁদের বাটীতে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাঙলাতে কথা কয়ে বাঁচা গেল। এতদিন একটাও বাঙলা কথা কইনি। এত দূরদেশে এসে (সিঙাপুর তখন খুব দূর ব'লেই বোধ হয়েছিল, আজকাল জগৎটা খুব ছোট ব'লেই বোধ হয়। আমাদের দেশে থেকে বাহ্যজগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না ; একবার বাহিরে এলে কিন্তু বিশ দিন বা ত্রিশ দিনের পথও দূর ব'লে মনে হয় না।) দেশের লোককে দেখে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করলুম, তা যিনি কখন আত্মীয় স্বজন মাতাপিতার স্নেহবন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূর প্রবাসে যান নি তাঁকে বোঝান কঠিন। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে চল্‌লুম। তিনি কয়েকবৎসর

রিক্‌স্‌ চ'ড়ে জেটির দিকে রওয়ানা হলুম। রিক্‌সওয়ালাকে তাঁরা আমি কোথায় যাব—তা মালয়ভাষাতে ব'লে দিলেন। রাস্তায় কিছুদূর এসে রিক্‌সওয়ালা আমায় কি জিজ্ঞাসা করিল আমি ত কিছুই বুঝলুম না। যাহা হৌক নিকটস্থ একজন শিখ্‌ পাহারাওয়ালা তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সিঙাপুরে সব শিখ্‌ পাহারাওয়ালা। মাথায় পাগ্‌ড়ি, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে পোষাক বেশ মানিয়েচে।

১৯ ডিসেম্বর। বৈকালে ৫ টার সময় জাহাজ হংকং অভিমুখে যাত্রা করিল। জাহাজে এসে চীনা বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি হংকং এ নেমে যাবেন। ইহার পরে ছয়দিন তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা কইবার যো ছিলনা। যে চীনা বয়্‌টি আমার কাজ কর্‌ত তাকে কোন হুকুম করলেই সে উত্তর দিত "yes, by and by"। তারপর আধ ঘণ্টা তার আর দেখা নেই! যদি বলতুম "স্নান করবার জল দাও" তাহলে সে বল্‌ত "by and by", চা নিয়ে এস, তখনো সেই এক কথা; এর বেশী কিছু আর সে জান্‌ত না।

কোন রকমে ছ'টা দিন কেটে গেল। ২৫ ডিসেম্বর, যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে রাত্রি ৯ টার সময় জাহাজ হংকং পৌছিল। তীর হতে কিছু দূরে নঙ্গর ফেলিল। এখান থেকে এ জাহাজ আবার কলিকাতায় ফিরবে। আমাকেও এখানে জাহাজ বদলাতে হবে। জাহাজ থেকে রাতে হংকংএর দৃশ্য অতি মনোহর। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট আলো জ্বল্‌চে, দূর থেকে সেগুলি দেখে আকাশের তারা ব'লে ভ্রম হয়। আকাশে যখন তারা থাকে তখন তারকা ও আলোক গুলিতে কোনো

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

সম্রাজ্ঞী ।   রাজপ্রাসাদ ।   সম্রাট ।

রিক্‌স চ'ড়ে জেটির দিকে রওয়ানা হলুম। রিক্‌সওয়ালাকে তাঁরা আমি কোথায় যাব—তা মালয়ভাষাতে ব'লে দিলেন। রাস্তায় কিছুদূর এসে রিক্‌সওয়ালা আমায় কি জিজ্ঞাসা করিল আমি ত কিছুই বুঝলুম না। যাহা হোক নিকটস্থ একজন শিখ্ পাহারাওয়ালা তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সিঙাপুরে সব শিখ্ পাহারাওয়ালা। মাথায় পাগ্‌ড়ি, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে পোষাক বেশ মানিয়েচে।

১৯ ডিসেম্বর। বৈকালে ৫ টার সময় জাহাজ হংকং অভিমুখে যাত্রা করিল। জাহাজে এসে চীনা বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি হংকং এ নেমে যাবেন। ইহার পরে ছয়দিন তাঁর সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথা কইবার যো ছিলনা। যে চীনা বয়্‌টি আমার কাজ কর্‌ত তাকে কোন হুকুম করলেই সে উত্তর দিত "yes, by and by"। তারপর আধ ঘণ্টা তার আর দেখা নেই! যদি বলতুম "স্নান করবার জল দাও" তাহলে সে বল্‌ত "by and by", চা নিয়ে এস, তখনো সেই এক কথা; এর বেশী কিছু আর সে জান্‌ত না।

কোন রকমে ছ'টা দিন কেটে গেল। ২৫ ডিসেম্বর, যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে রাত্রি ৯ টার সময় জাহাজ হংকং পৌঁছিল। তীর হতে কিছু দূরে নঙ্গর ফেলিল। এখান থেকে এ জাহাজ আবার কলিকাতায় ফিরবে। আমাকেও এখানে জাহাজ বদলাতে হবে। জাহাজ থেকে রাত্রে হংকংএর দৃশ্য অতি মনোহর। পাহাড়ের উপর ছোট ছোট আলো জ্বলচে, দূর থেকে সেগুলি দেখে আকাশের তারা ব'লে ভ্রম হয়। আকাশে যখন তারা থাকে তখন তারকা ও আলোক গুলিতে কোনো

সম্রাজ্ঞী। রাজপ্রাসাদ। সম্রাট।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

প্রভেদ থাকেনা ; সব একাকার হয়ে যায়। মনে হয় আকাশ নেমে এসে পর্ব্বত গাত্রে মিশে গেছে।

জাহাজ থাম্‌লে সকলেই নেমে গেল। একে বিদেশ কিছুই জানা শোনা নেই, তাতে আবার বৃষ্টি হচ্ছিল, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে সে রাত্রি আমি জাহাজেই থেকে গেলুম। চীনা বন্ধুটি পরদিন প্রাতে এসে আমাকে সহর দেখাতে নিয়ে যাবেন ব'লে গেলেন।

গভীর রাত্রি, সকলেই নেমে গেছে। জাহাজখানা যেন শ্মশানের মত নির্জ্জন বোধ হতে লাগ্‌ল। আমার চোখে ঘুম নেই ; ভয় হতে লাগ্‌ল পাছে কেউ এসে টাকাকড়ি কেড়ে নেয়। বিদে[illegible]কা কড়ি না থাক্‌লে কি উপায় হবে ভাবতে লাগ্‌লুম। মাঝে মাঝে দু'একজন নাবিকের পদশব্দে চম্‌কিয়া উঠ্‌তে লাগ্‌লুম। ছেলেবেলায় উঠ্‌তে বস্‌তে কথায় কথায় বাটীর মেয়েরা ভয় দেখিয়ে কাপুরুষ করে দিয়েচে আজপর্য্যন্ত সে ভয় কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি! সমস্ত রাত আর্থিক সম্বল ওভারকোটের ভিতরকার পকেটে রেখে, পোশাক্‌ পরেই শুয়ে রইলুম। ঊষার উন্মেষে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রের সমস্ত ভয় ভাবনা অন্তর্হিত হ'ল। নিশার অন্ধকার লোকের মনে যেমন ভয়ের সঞ্চার করে, দিবালোক তেমনি আমাদের মনে সাহস এনে দেয়। তাই গত রাত্রের মানসিক দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করে হাসি এল।

জাহাজের চীনা "কম্প্রাডোর" এক চীনা মাঝির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্‌লেন সে পরদিন আমাকে মার্কিন জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে আস্‌বে। আমাদের জাহাজের আসে পাশে অনেক জাহাজ। কোনটিতে ইংরাজের পতাকা, কোনটিতে জর্ম্মাণ পতাকা, কোনটিতে বা উদীয়মান

সূর্য্যাঙ্কিত জাপানী পতাকা। চীনা মাঝি "পিজিন" ইংরাজি বলে। এবার যে জাহাজে যাব তার নাম "মোঙ্গোলিয়া"। নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম অবশ্য ইংরাজিতে—"তুমি 'মোঙ্গোলিয়া' জাহাজ চেন ত?" উত্তর হল—"you go Manchoo, I know you!" কিছু বুঝতে না পেরে আরও দুই তিনবার ঐ প্রশ্ন করলুম, সেই এক উত্তর, একটি কথা কমও নয়, বেশীও নয়। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আমার টিকিট কিনতে হবে, জাহাজ আপিসে নিয়ে চল।" সে সম্মত হ'ল ও সত্য সত্যই জাহাজ আপিসে পৌঁছে দিল।

সকাল বেলা বৃষ্টি পড়ছিল, কুয়াসাও ছিল। দ্বিপ্রহরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। যথাসময়ে চীনা বন্ধুটির সঙ্গে সহর দেখতে গেলুম। তাঁর সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক বালক ছিল। তার চীনা মা ও য়ুরোপীয় পিতা। বেশ চালাক চতুর, সুন্দর ইংরাজি বলে। বালকটিও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে শুনে আনন্দ হ'ল। সে হংকংএর গলি-ঘুঁজি সব চেনে।

ছেলেটি প্রথমে আমাদিগকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। একটি অনতিপ্রশস্ত ঘরে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজান ছিল। দুইটী চীনা রমণী সে ঘরে ছিলেন। একজন ছেলেটির মা, আর একজন আত্মীয়া হবেন। তাঁরা ইংরাজি বলতে পারেন না আমিও চীনাভাষা জানিনা, তাই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলুম। তাঁরা ছোট ছোট বাটিতে দুগ্ধশর্করাবর্জ্জিত চীনা চা দিলেন। বাটিগুলির আকার দেখে বোধ হ'ল সেগুলি পাখীকে জল দিবার জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। মনুষ্যরূপ শ্রেষ্ঠ জীবের জন্য বাটিগুলি কিছু বড় হ'লেই

ভাল। কিছুক্ষণ পরে বালকটিকে আমার হয়ে রমণীদ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে বলে বিদায় হলুম।

আমরা তিনখানা "সিডান চেয়ারে" চড়ে রওয়ানা হলুম। এ একপ্রকার খোলা পাল্কী। মানুষে বয়ে নিয়ে যায়। একজন বেশ আরামে চড়তে পারে। এখানেও রাস্তায় শিখ্ পুলীস। হংকং সহরকে দুইভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী, সমতল; অপরটি পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। প্রথমে বাজারের মধ্য দিয়া গেলুম। অনেক লোকের ভিড়। কোথাও রাশীকৃত ডিম্ব, কোথাও ফলমূলের দোকান; কোথাও বা নানারকম শাক্সব্জী বিক্রয় হচ্চে। এ স্থানটি বড় ঘেঁষাঘেঁষি ও অপরিচ্ছন্ন ব'লে বোধ হ'ল। তারপর ভাল রাস্তায় এসে পড়লুম। এখানকার বাটীগুলি ইষ্টক বা প্রস্তরে নির্ম্মিত। জাহাজ কোম্পানির আপিস, য়ুরোপীয় সৌখিন জিনিষের দোকান, ধনাগার, ভোজনালয় প্রভৃতি। ক্রমে আমরা উঁচুতে উঠতে লাগলুম। এখানকার বিখ্যাত "পীক ট্রামওয়ে"র ষ্টেসনে গিয়ে অবতরণ করলুম।

"পীক ট্রামওয়ে" এক অদ্ভুত জিনিষ। পর্ব্বতের তলদেশ থেকে দেখ্লে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হতে হয়। খাড়া পাহাড়ের গা দিয়ে একখানা গাড়ি নেমে আস্চে ও সঙ্গে সঙ্গে একখানা উঠে যাচ্চে। গাড়ির তলায় লৌহরজ্জু সংলগ্ন আছে। পর্ব্বতোপরিস্থ এঞ্জিনদ্বারা এই রজ্জু যুগপৎ গুটিয়ে নেওয়া হচ্চে ও খুলে দেওয়া হচ্চে, একবার ছিন্ন হ'লে মনে হয় বড় দুর্ঘটনা ঘট্বে। প্রত্যহ অনেক লোক এই ট্রামে উঠা নামা করে। পদব্রজে পাহাড়ে উঠিবার একটি রাস্তা আছে। এ রাস্তাটি বেশ নির্জ্জন ও ছায়াশীতল। মধ্যে মধ্যে পথিকদের ব্যবহারের জন্য বেঞ্চ্ পাতা আছে।
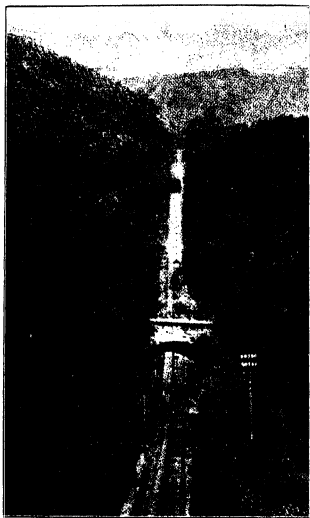
হংকং পীক ট্রামওয়ে।

পাহাড়ের উপরে যেখানে ট্রামওয়ের শেষ, সেইখানে একটি সুন্দর য়ুরোপীয় হোটেল আছে। হোটেলটির নাম, পীক্ হোটেল। ট্রাম থেকে নেমে পদব্রজে পাহাড়ে উঠ্‌তে হয়। রাস্তাগুলি অতি সুন্দর, পাথর দ্বারা বাঁধান থাকা হেতু চলিবার খুব সুবিধা। য়ুরোপীয়ানদের সুদৃশ্য "ভিলা"গুলি পাহাড়ের শোভাবর্দ্ধন করেচে। ইংরাজদের

সৈন্যাবাসও এইখানে। পাহাড়ের উপর উঠিবার সময় মধ্যে মধ্যে বিউগলের শব্দ শুন্‌তে পেলুম। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটি পতাকা উড়্‌চে। এখান হতে সমুদ্রে বড় বড় জাহাজগুলিকে অতি ক্ষুদ্র, মোচার খোলার মত বোধ হ'ল। পাহাড়ে উঠ্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, এক চীনার নিকট লেমনেড কিনে পান করলুম।

পীক্ ট্রামে নেমে এলুম। নাম্‌বার সময় মনে হয় যেন পাতালে প্রবেশ করচি। সাবধানে বসে থাকতে হয়, নচেৎ উপুড় হয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সেদিন সন্ধ্যার সময় জাহাজে ফিরবার আগে সকলে মিলে ভোজনালয়ে বেশ তৃপ্তিসহকারে আহার করা গেল। চীনা বন্ধুটি একটিও চীনা কথা কইলেন না, সেজন্য ছেলেটি আহারাদির হুকুম দিল।

চীনা বন্ধু ও ছেলেটির নিকট বিদায় নিয়ে সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে এলুম। পরদিন দ্বিপ্রহরে "মোঙ্গোলিয়া" ছাড়্‌বে।

২৭শে ডিসেম্বর। সকালে উঠে অবধি চীনা মাঝির প্রত্যাশায় বসে আছি। সে আর আসে না। ভাবনা হচ্চে যদি না আসে তা হ'লে বুঝি যাওয়াই হয় না। বেলা ১০টার পর মাঝি এল। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র নৌকায় নিয়ে রওয়ানা হলুম। প্রায় আধ ঘণ্টার পর জাহাজ দেখা গেল। বিরাট্ আকার জাহাজ, নামটা কিছুদূর থেকে পড়ে নিশ্চিন্ত হলুম।

জাহাজের যেখানে মাঝি আমার জিনিষপত্র তুলে দিলে, সে স্থানটা বড় ময়লা, একটা মস্ত দালানে অনেক লোক দেখ্‌লুম। সবই চীনা ও জাপানী নিম্নশ্রেণীর লোক। একজন জাপানীকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা

করলুম সেই স্থানটা কি য়ুরোপীয়ান ষ্টীয়ারেজ? আমার সেই শ্রেণীর টিকিট ছিল। জাপানী তার নিজের ভাষায় কি বল্‌লে কিছুই বুঝলুম না। এই ময়লা জায়গায় এই সব লোকের সঙ্গে কেমন করে যাব? তারা সকলে কম্বল বিছিয়ে, কেহবা নিজ নিজ বাক্সের উপর বসে গল্পগুজব কচ্চে। কেহবা কমলালেবু খাচ্চে। পিতাঠাকুরের উপর রাগ, অভিমান হ'ল। কেন তিনি উচ্চশ্রেণীর টিকিট কিনে দেন নি? এই কত দিন চীনা জাহাজে কষ্ট পেয়ে এসেচি, আবার কি যথাপূর্ব্ব তথাপর?

মাঝিকে বিদায় করে দিলুম। সে এক ডলার বেশী নিয়ে গেল। সে সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করবার ইচ্ছা হ'ল না।

ভাল কথা মনে পড়েচে; এ জাহাজখানি যে আমেরিক্যান। অবশ্য আমেরিক্যান কর্ম্মচারী আছে। তারাত ইংরাজি বলে, তাদের জিজ্ঞাসা করলে সব জানা যাবে। ভাবচি, এমন সময় দেখি এক সাহেব যাচ্চেন। টুপিতে লেখা "য়ুরোপীয়ান্ ষ্টীয়ারেজ।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লুম আমি ভুল জায়গায় উঠেচি। যে স্থানে উঠেচি সেটি "এসিয়াটিক ষ্টীয়ারেজ," এ শ্রেণীতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাতায়াত করে। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি "য়ুরোপীয়ান ষ্টীয়ারেজ" অতি সুন্দর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; যাত্রীও বেশী নয়। এটিও একটি দালান। দুধারে যাত্রীদের বিছানা, berth। সর্ব্বসমেত চুয়াল্লিসটি ছিল। 'বার্ত'এর উপর "লাইফ বেল্ট্।" সমুদ্রে ঝড় তুফানে জাহাজ ডুবিয়া গেলে এগুলি কোমরে সংলগ্ন করে সাঁতার দিতে হয়। "বেল্ট্" পরা থাক্‌লে ডুবিবার আশঙ্কা নেই। দালানের মাঝখানে আহারের লম্বা টেবিল। দেয়ালের সংলগ্ন লোহার নলের ভিতর জলীয় বাষ্প

ভ'রে ঘর গরম করবার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এইরূপে উত্তাপের সমতা রক্ষা হয়।

চীনা বয়, এ বেশ ইংরাজি বুঝে, এসে বিছানার চাদর, গায়ে দিবার কম্বলের উয়াড় প্রভৃতি বদ্‌লে দিয়া গেল। না বুঝে বাবার উপর অন্যায় অভিমান করেছিলুম ভেবে অনুতাপ হ'ল।

এসিয়াটিক্ ও য়ুরোপীয়ান্ ষ্টীমারেজের মাঝখানে একটি গলি পথ। অনেকখানি রাস্তা হবে। জাহাজ একটু পরেই ছাড়্‌বে, সকলেই ব্যস্তভাবে ছুটাছুটী করচে। আমার 'একমনি' ও 'দুইমনি' ট্রাঙ্ক্‌গুলি, যেখানে প্রথমে উঠেছিলুম সেইখানেই পড়ে আছে। সে গুলি নিয়ে আসাত সহজ কথা নয়। অনেক কষ্টে সে গুলিকে টেনে টেনে নিয়ে এলুম। যত কষ্ট ভোগ করতে হ'ল আমাকে, আর চীনামাঝি, যে সব কষ্টের মূলে সে ফাঁকি দিয়ে এক 'ডলার' বেশী নিয়ে গেল! চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমারও তাই হ'ল। সকাল থেকে কিছু আহার হয় নি; ব্যায়ামও যথেষ্ট হওয়াতে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল, কিন্তু জাহাজ না ছাড়লে খাবার দেবার রীতি নেই। মিছামিছি চীনা মাঝিটার উপর রাগ করে ক্ষুধা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই বুঝে "রাগটা সামলে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।"

২টার কিছু আগে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজ চল্‌চে কি দাঁড়িয়ে আছে কিছুই বুঝা যায় না, একেবারেই দোলে না। কলিকাতা থেকে হংকং আস্‌তে জাহাজের ঝাঁকানিতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাবার দিয়া গেল। সে দিন অনেক খেয়ে ফেল্‌লুম। জঠরে যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, তখন আর বাচ্‌বিচার

করবার অবসর থাকে না। সম্মুখে যা আসে তাই খেতে ইচ্ছা হয়।

আমার সহযাত্রীরা সকলেই চীনা। তারা সব সময়েই শুয়ে থাকত, টেবিলে খাবার দিয়ে গেলে উঠে খেত, তারপর আবার শুয়ে পড়্ত। এদের কতকগুলি কদভ্যাস ছিল, তার মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলা একটি।

৩০শে ডিসেম্বর জাহাজ ষাঙহাই বন্দরে পৌছিল। ইয়াংসিকিয়াং নদীর মুখে নঙর করিল। নদী এইখানে খুব প্রশস্ত, অনেকটা ডায়মণ্ড্ হার্বারের গঙ্গার মত। নদীর জলও গঙ্গার (কলিকাতার) জলের মত ঘোলা। এখানে এসে যেমন শীত বোধ হয়েছিল এমন জীবনে কখন হয়নি। গায়ের রক্ত যেন জমে যেতে লাগ্ল। ষাঙহাইয়ে তখন মড়ক, তাই আমরা বন্দরে যাবার অনুমতি পেলুম না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা কিন্তু সকলে ষ্টীমারে উঠে সহর দেখ্তে গেলেন। তাঁহাদের টাকা আছে কি না, সে জন্য তাঁহাদের রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই!

এইবার জাপানের প্রথম বন্দর নাগাসাকি। ১৯০৬ সালের প্রথম দিন রাত্রি ৯টার সময় জাহাজ নাগাসাকি পৌছিল। পরদিন প্রাতে নৌকা চড়ে তীরে গিয়ে নাম্লুম। সবই যেন কেমন নূতন নূতন বোধ হতে লাগ্ল। রাস্তা দিয়ে একটু অগ্রসর হয়েই দেখি, একদল লোক ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে যাচ্চে। তাদের পশ্চাতে অনেক লোক কালো কালো চিত্রিত পোষাক পরে বড় বড় বাঁশ নিয়ে যাচ্চে। বাঁশের গায়ে চওড়া কাপড়ের ফালি লাগান। তাতে চীনা অক্ষরে যা লেখা ছিল, তা আমার

বোধগম্য হয় নি। অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, যেমন সবদেশেই হয়ে থাকে, বাজনার শব্দ শুনে পিছনে পিছনে চলেচে।

এখানেও বেশ শীত। তবে ষাঙহাইয়ের মত নয়। রাস্তার দুধারে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী। সেখানে জিনিষপত্র বিক্রী হচ্চে। স্থানটা বড় ঘেঁজ্ঞি ব'লে বোধ হ'ল। এ রাস্তা সে রাস্তা অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে জাহাজে ফিরে এলুম। এসে শুন্‌লুম দ্বিপ্রহরের খাওয়া হয়ে গেছে। 'বয়্' কিছু রুটি ও 'জ্যাম' দিল, তাই খেয়েই তখনকার মত চুপ করে থাক্‌তে হ'ল।

বৈকাল বেলা কয়েকখানা কয়লা বোঝাই নৌকা জাহাজের গায়ে এসে লাগ্‌ল। নৌকায় অনেক জাপানী মজুর ছিল। তারা জাহাজে কয়লা বোঝাই করতে লাগ্‌ল। এরা সকলেই ক্ষুদ্রকায়, দেখ্‌তে কদাকার তার উপর গায়ে কয়লা মাখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কয়লা তোলা দেখ্‌লুম। তাদের কথার একটাও বুঝতে পারলুম না, বড়ই শ্রুতিকঠোর বোধ হ'ল। এই প্রথম জাপানী নিম্নশ্রেণীর লোক দেখ্‌লুম।

বাটী ছেড়ে পর্য্যন্ত মাথার চুলও কাটা হয় নি, দাড়িও কামান হয় নি। স্বহস্তে দাড়ি কামান, এই অতিপ্রয়োজনীয় বিদ্যাটা তখনও শিখি নি। দেশে থাক্‌তে সব বিষয়েই পরের মুখাপেক্ষী হতে শিখে ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। একে ত এই চেহারা, তার উপর পোষাকের কি বাহার! পোষাকটি প্রায় দুই বৎসর আগে তৈয়ারি হয়েছিল, ও বর্ত্তমান সময়ে ছোট হয়ে যাবার দরুণই হোক্, কি আমার শরীরের বৃদ্ধি হেতুই হোক্, আমাকে এমন দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেছিল যে

ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালন কর্‌তে পারতুম না। ইংরাজি পোষাকের কোন্‌খানে কি পরতে হয় তখন তাই জানি না। তারপর বাটী থেকে এ পর্য্যন্ত পাগ্‌ড়িরূপ একটা বৃহৎ বোঝা বইতে বইতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। মনে পড়ে, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ষ্টোরসে যখন বাবার সঙ্গে সওদা করতে গিয়েছিলুম; এক সুপুরুষ ব্যক্তি জোড়হাত করে বাবাকে বল্‌লেন, "মশায় এ স্বদেশীর দিনে ছেলেকে আর টুপি কিনে দেবেন না। আমরা জানি জাপানে আমাদের ছেলেরা সকলেই পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করে, ওঁকেও তাই কিনে দিন।" আমি ভাবলুম তা যদি হয়, তা হ'লে আমিও পাগড়িই ব্যবহার কর্‌ব। এর জন্য পরে অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম।

এক বন্ধু, লম্বা কাপড়খানা মাথায় জড়িয়ে কেমন করে তাকে পাগ্‌ড়ির আকার দান কর্‌তে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যহ অনেক চেষ্টা করে মাথার উপর পাগ্‌ড়ির মত একটা কিছু দাঁড় করাই, ও এত বড় একটা কাজ করে ফেল্‌লুম ভেবে নিশ্বাস ছাড়ি, অমনি ফস্‌,—সব খুলে যায়। আবার পনের মিনিটের ধাক্কা!

হতাশ হয়ে নাগাশাকিতে এসে পাগ্‌ড়ি বাক্সে বন্ধ কর্‌লুম। অনেক দিনের একটা টুপি বাক্সের তলায় পড়ে ছিল, সেটি ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। এতে চেহারার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হ'ল তা নয়, তবে অনেকটা আরাম পাওয়া গেল। ঘাড় থেকে "ভূতের বোঝা" নামিয়ে স্বাধীন হলুম।

সে দিন রাত্রে কয়েকজন আরোহী এলেন। তার মধ্যে একটি জাপানী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে লইয়া এলেন। আর একজন রুশিয়ান্‌। সেই রাত্রে জাপানী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি

হাওয়াই যাচ্চেন। লোকটি ক্রিষ্টিয়ান্। অল্প অল্প ইংরাজি বল্‌তে পারেন। আমি জাপানে শিক্ষা কর্‌তে যাচ্চি শুনে খুব আহ্লাদিত হলেন। সে রাত্রে তাঁর স্ত্রীর সহিত দেখা হয় নি, তিনি রমণীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ছিলেন। পরদিন তাঁর সহিত আলাপ হ'ল। তিনি সুন্দর ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। এই প্রথম জাপানী মহিলার সহিত আলাপ। মনে হ'ল জাপানে সকল মহিলাই যদি এঁর মত ইংরাজি বলেন ত আলাপ করবার বড় সুবিধা হবে, ও জাপানে থাকা কষ্টকর হবে না। তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, মাতাপিতার জন্য মন কেমন করে কি না? কেমন করে মা আমাকে ছেড়ে দিলেন? তাঁর সস্নেহ প্রশ্নগুলি শুনে তাঁকে বড়ই আপনার লোক ব'লে মনে হ'ল। শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ করে কত সুখ তা এই প্রথম বুঝ্‌লুম।

মহিলাটির স্বামী বড়ই গো বেচারি, সে জন্য তাঁকে বড় কষ্ট পেতে হত। আহারের সময়ে তাঁর আস্‌তে একটু বিলম্ব হত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য কর্‌তেন। ইত্যবসরে যেই টেবিলে খাবার দিয়া যেত, অমনি চীনা যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যগুলি বাঁটোয়ারা করে নিতেন। খাবার যে সকলের জন্য দেওয়া হয়েচে ও সেই অনুসারে সকলেরই ভাগ করে নেওয়া উচিত, তা শিক্ষাভাববশত তাঁদের মনেই হত না। জাপানী ভদ্রলোকটি, আলুসিদ্ধ, রুটি ও কফি ছাড়া বড় একটা কিছু পেতেন না। তাঁর দুরবস্থা দেখে তাঁর প্লেটের উপর প্রত্যেক জিনিষ কিছু কিছু রেখে দিতুম।

আমার পার্শ্বে রুশিয়ান্ ভদ্রলোকটি বস্‌তেন। তিনি ইংরাজি বল্‌তে পারতেন না, কিন্তু ইসারায় তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হত। আহারের

সময় রুটি, চা, চিনি প্রভৃতির রুশীয় নাম শিখাইতেন। চীনা যাত্রীদের অভদ্রোচিত ব্যবহারে বড় বিরক্তি প্রকাশ করতেন।

নাগাশাকি থেকে দুটি বিদেশিনী সুন্দরী উঠেছিলেন। চেহারার সাদৃশ্য দেখে দুই ভগ্নী বলেই মনে হয়েছিল। তাঁরা আমেরিক্যান; জাহাজের আমেরিক্যান কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের খুব আলাপ হ'ল। আমারও বড় ইচ্ছা হত তাঁদের সঙ্গে আলাপ করি। ইচ্ছাটাকে কার্য্যে পরিণত করা বড় শক্ত ব্যাপার!

ভোরের বেলা জাহাজ ছেড়েচে। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যা হতে আর বিলম্ব নেই, দেখি সকলে ডেকের উপর ছুটে চলেচে। আমিও ব্যাপার কি দেখবার জন্য উপরে গেলুম। ক্লান্ত সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েচে। স্থির, অচঞ্চল, সমুদ্র রমণীর নীল বসনের মত ছড়ান রয়েচে। অনেক ছোট ছোট দ্বীপ জাহাজের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। দু চার খানা পালতোলা নৌকা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে। নৌকার উপর মাঝিরা অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্যের অন্তিমজ্যোতি তাদের রৌদ্রদগ্ধ মুখ উদ্ভাসিত করেচে।

ধীর, মন্থর গতিতে, একটা বিশাল তিমি মাছের মত, আমাদের প্রকাণ্ড জাহাজ খানা দ্বীপপুঞ্জের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগ্ল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতাভা, মৃদু সমীরণ, ও শান্ত সুন্দর জলধি আমা হেন বেরসিকের মনেও বেশ একটু কবিত্বভাব জাগিয়ে তুলিল। এমন সময়, পাঠকপাঠিকা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন,—বিদেশিনী সুন্দরী দুজন, ঠিক আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। বল্লে বোধ হয় বিশ্বাস করবেন না, তাঁদের মধ্যে যিনি কানষ্ঠা তিনি আমার পার্শ্বেই

একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন। তারপর যা ঘট্‌ল তা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি ; সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা বেজেচে বলতে পারেন কি ? ভাবলুম মস্ত সুযোগ এসেচে, এইবার আলাপ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ঘড়ি বার করে ব'লে দিলুম, চারটে। সুন্দরী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন,—must be a funny watch indeed!—মজার ঘড়ি দেখচি! আমি ত মরমে মরে গেলুম। লজ্জায় আমার মুখ লাল,—না, না, ভুল করে ফেলেচি, আমার মুখ যে মনের কোন অবস্থাতেই লাল হতে পারে না—ঘোরতর কালো হয়ে উঠ্‌ল। আমার তখনকার মনের অবস্থা অনেকটা সীতাদেবীর মত, ইচ্ছা হ'ল ধরণী দ্বিধা হউক, আমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ি!

আর কিছু ভাল লাগ্‌ল না। তখনই ঘরে নেমে এলুম। ঘড়িটা বার করে দেখি, অনেকক্ষণ আগে থেকে সেটা বিশ্রাম করচে। যখন সুন্দরী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ঘড়িটা ত বুঝ্‌ল না, না ব'লে কয়ে থেমে গিয়ে কি অনর্থ ঘটালে! একে একে সুন্দরীদের সঙ্গে পরিচয়ের পথে অন্তরায়গুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আমার "সুন্দর" চেহারা, অদ্ভুত পোষাক, অবশেষে "পচা" ঘড়ি! পাঠিকা মহোদয়ারা বোধ হয় হাস্‌চেন। বিদেশিনীরা ত জান্‌তেন না, যে দেশে থাকৃতে আমাকে ঠাকুরমা, পিশিমা, মাতাঠাকুরাণী সকলেই "শ্যামবর্ণ ফুট্‌ফুটে ছেলে" ছাড়া কিছু বল্‌তেনই না। গায়ের রংটা আর একটু পাতলা হ'লে, আমি যে এমন কি "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ" হতে পারতুম, তা সাক্ষী ডেকে এখনও প্রমাণ করে দিতে পারি।

জাপান।

সেদিন সন্ধ্যাভোজনের সময় মনটা বড় খারাপ ছিল, তাই "হতাশ ভাবে" অনেক খেয়ে ফেল্লুম !

এর পর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। কোবে বন্দরেও সড়কের জন্য নাম্‌তে পারি নি। বলা বাহুল্য এ কয়দিন বড় একটা ঘরের বাহির হতুম না, ভয়, পাছে বিদেশিনী সুন্দরীদের সাম্‌নে পড়ি। এ মুখ আর তাঁদের দেখাব না, মনে মনে স্থির করেছিলুম।

৭ই জানুয়ারি প্রত্যুষে উঠে, ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তীরে যাবার জন্য নৌকার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম। ডেকের উপর জাপানী মহিলাটি শীতবাতাস উপেক্ষা করে, তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নি; ঊষার অস্পষ্টালোকে য়োকোহামার সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বাড়ীগুলো অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল। দীর্ঘ একমাসের সমুদ্রযাত্রার পর অবশেষে যখন কূল দেখ্‌তে পেলুম, তখন যে মনে অমিশ্রিত হর্ষেরই উদয় হয়েছিল তা বল্‌তে পারিনে। পূজা ফুরিয়ে গেলে ছেলেবেলায় বড় কষ্ট হত; মনে হত যতদিন আশায় আশায় থাকা যায় ততদিনই ভাল, একবার এলে শীঘ্রই ফুরিয়ে যায়। যেখানে অনেকদিন হতে আস্‌তে চেয়েছিলুম, সেখানে পৌঁছে আনন্দ হ'ল বটে, কিন্তু জাপানী মহিলাটি, তাঁর স্বামী ও তাঁদের ছোট ছেলেটিকে ছেড়ে যেতে কষ্ট বোধ হতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল আর কিছুদিন বিলম্বে পৌঁছিলে ক্ষতি ছিল না।

নৌকায় জিনিষপত্র তুলে নিয়ে রওনা হলুম। যখন তীরে গিয়ে উঠ্‌লুম, তখন নবোদিত সূর্য্য উঁকিঝুঁকি মার্‌চেন। শুল্কালয়ে বেশী বিলম্ব হ'ল না। দুই একটা ট্রাঙ্ক্ খুলে দেখিয়েই খালাস পাওয়া গেল।
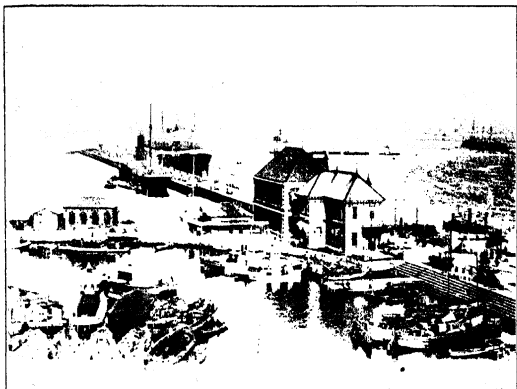
য়োকোহামা জেটি।

রিক্স চ'ড়ে রেলষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হবার সময় সমুদ্রের ধারে অনেকগুলি পাকাবাড়ী দেখ্‌লুম। ছোট হলেও, পাকাবাড়ী। য়োকোহামা ছোট জায়গা কিনা, সেজন্য বাড়ীগুলি ছোট; তোকিও সহর অবশ্যই খুব জাঁকাল হবে! রিক্স রেলষ্টেসনে থাম্‌তেই একজন লালটুপিপরা মুটে এসে দাঁড়াল। ব'লল, তোকিও? আমি উত্তর দিলুম তোকিও। সেকেণ্ড্ ক্ল্যাস্?—সেকেণ্ড্ ক্ল্যাস্। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি ট্রেনে বসে। মুটে আমার টিকিট করে দিয়েচে। লাগেজগুলি তুলে দিয়েচে, ও যে কয়টি লাগেজ ছিল, সেই কয়খানি পিতলের চাক্তি দিয়েচে। তোকিও পৌঁছে সেগুলি দেখালেই লাগেজ পাব।

জাপান।

একখানা লম্বা গাড়ীতে আমি উঠেচি। আরোহীরা সবই জাপানী। অনেকেই এক একখানা খবরের কাগজ পড়্‌চেন। একখানা কাগজও ইংরাজি অক্ষরে লেখা নয়, সবই দুর্ব্বোধ্য চীনা অক্ষরে ছাপা।

ট্রেনখানা ডাক্‌গাড়ী; তাই কোথাও না থেমে একেবারে "ষিম্‌বাষি" এসে থাম্‌ল। ও হরি! এই বুঝি তোকিওর রেলষ্টেসন! এ যে আমাদের কোন্নগর ষ্টেসনের মত! রিক্‌স ভাড়া করে একখানাতে জিনিষপত্তর ও একখানাতে দেহ বিন্যস্ত করে রওয়ানা হলুম। ভারতীয় ছাত্রেরা যেখানে থাকেন, সেই ঠিকানায় নিয়ে যেতে বল্‌লুম। রাস্তায় এসে, যা দেখ্‌ব ভেবে এসেছিলুম ও যা দেখ্‌লুম, তার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। মনে মনে যে হেমমন্দির গ'ড়ে তুলেছিলুম, তা মুহূর্ত্তে তাসের কেল্লার মত গুঁড়া হয়ে গেল। সবই যেন চোখে অদ্ভুত ও অবাস্তব ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।

প্রায় একঘণ্টা পরে একটা সেঁতসেঁতে গলির ভিতর এসে ঢুক্‌লুম। দুধারে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী। একটা বাড়ীর সাম্‌নে ল্যাম্পে "ভারতীয় ছাত্র" লেখা ছিল। সেইখানে নাম্‌লুম। বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে গিয়ে দেখি, দোরগোড়ায় কে একজন জুতা পরচেন বা খুল্‌চেন। তাঁকে বাংলাতে বল্‌লুম, বড় শীত। তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, আমি মারাঠি। ইতিমধ্যে উপর থেকে গোঁফদাড়িবিশিষ্ট একটি লোক নেমে এলেন। তিনি একখানা কম্বল আলোয়ানের মত করে গায়ে দিয়েছিলেন। আমাকে উপরে উঠ্‌তে বলাতে আমি সজুতা উঠ্‌তে যাচ্ছিলুম, তিনি ব্যস্তভাবে বল্‌লেন জুতাটা খুলে রাখুন। ভাব্‌লুম, এদেশে দেখ্‌চি সবই নূতন! চিরকালটা জুতা

পরে ঘরে ঢুকে এলুম, এখানে তার বিপরীত! ঠাকুরঘর ত আর নয়!

শীতে হাতের আঙুল জমে যাবার উপক্রম হয়েছিল, জুতা খুল্‌তে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। উপরে উঠে যে ঘরে গেলুম, সেখানে দেখি আসবাব পত্র বিশেষ কিছু নেই। ঘরের মেঝে গদির মত পুরু মাতুরে মোড়া। চাকরাণী এসে একটা কাঠের চৌকোণা বাক্সে, ছাইয়ের উপর কয়েক খানা জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে গেল। এতে হাত গরম করতে হবে! হাড়ভাঙ্গা শীতে এ কি ব্যবস্থা? মনে করেছিলুম, ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড চুলোতে আগুন জ্বল্‌চে, ঘরে ঢুকলেই শরীর গরম হয়ে যাবে। শরীর গরম হওয়া দূরে থাক্ হাতের আঙুল কটাই গরম হয় না!

চাকরাণী ছোট একটা বাটিতে কি একটা জলীয় পদার্থ দিয়ে গেল। কম্বলগায়ে বন্ধুটি বল্‌লেন সেটা হচ্চে চা। হায়, হায়! এই চা পান করে কেমন করে এতগুলো বছর কাটাব? সে দুধও নেই, চিনিও নেই, গোলাপী রঙও নেই; এত হংকংএ যে চা পান করেছিলুম সেই চা। এক কাপ্ চাও পান করতে পাব না, কেন মরতে এলুম এমন দেশে!

এইবার চাকরাণীর একটু রূপ বর্ণনা করি। সে বৃদ্ধা, কিন্তু "উঁচু-দিকে" একেবারেই বাড়ে নি। সমতল মুখের উপর নাক্‌টা আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি। চোখ দুটো যেন মরুভূমির মাঝে ক্ষুদ্র "ওয়েসিস!" ভ্রূ কামান, দশন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, অধরে মৃদু হাসি, তাকে দেখে দারজিলিঙের পথে "ঘুম ডাইনী"র কথা মনে পড়ে গেল।

দেখ্‌লুম এখানেও এঁরা ভাত ডাল খান। "সাহেব" হবার সাধ ঘুচে গেল। এরা দেখ্‌চি বাঙালীরও অধম!

কয়েকজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে দেখে শরীরের উপরার্দ্ধ নুইয়ে আমাকে অভিবাদন কর্‌লেন। এর অর্থ তখন বুঝ্‌লুম না।

আহারাদির পর বৈকালে প্রায় দশ বার জনে মিলে অস্ত্রপ্রদর্শনী দেখ্‌তে বেরুলুম। রাস্তায় যে পোষাকটা পরেছিলুম সেটা বদ্‌লে নূতন পট্টুর পোষাক পর্‌লুম। রাস্তায় পরি নি পাছে ময়লা হয়ে যায়! জাপানে পৌঁছে এ পোষাকটা পরে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেব ভেবেছিলুম। এ পোষাকটা ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্‌সের "কাটার সাহেব" যাতে আমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পর্‌তে পারি, খুব সম্ভবত তাই ভেবে তৈরি করেছিলেন! যত মোটাই হই না কেন পোষাকের চেয়ে হতে পারব না! আমার এই "প্রশস্ত-হৃদয়" পোষাকটি তার রহস্যময় ভাঁজের মধ্যে আমার মত দুটি লোককে আবদ্ধ কর্‌তে পার্‌ত।

বন্ধুদের মধ্যে দু একজন ব'লে দিলেন, অবশ্য গোপনে, "হাঁট্‌বার সময় লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌বেন। নির্জীবভাবে চল্‌লে এখানকার লোকে ঘৃণা করে, তার সাক্ষী চীনা ছেলেরা। তারা নেহাত "হালছেড়ে" দিয়ে চলে ব'লে জাপানীরা তা'দিগকে মোটেই পছন্দ করে না।" বিনীতভাবে বল্‌লুম, যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব; কি জানি যদি তাঁরা আমার পাড়াগেঁয়েমি দেখে বিরক্ত হন। তাঁরা যে কত বড় "সাহেব," তা কিছুদিনের মধ্যেই...! কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌লুম, যাক আসে যায় না; এটা স্বগতভাবে বলা হয়েচে।

বুক উঁচু করে যথাসাধ্য সোজা লম্বা চালে চল্‌তে লাগ্‌লুম। কোটের ভারে স্কন্ধদেশ টাটিয়ে উঠ্‌ল। ছেলেবেলায় একবার পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলুম। পিতাঠাকুরের জনৈক বন্ধু আমার ছোট দুই ভাইয়ের জন্য দুটি ওভারকোট তৈয়ারি করিয়ে দিয়েছিলেন। কোটগুলি হয়েছিল মন্দ নয়, কিন্তু কোটের কাপড়টি, আমাদের দেশে পাহারাওয়ালারা শীতে যে কাপড়ের ওভারকোট পরে সেই কাপড়। ভীষণ ভারি। প্রথম প্রথম ভায়ারা, শরীরে তখন তাদের বিশেষ শক্তি ছিল না, কোট পরে হাঁট্‌তে গেলেই উল্‌টে পড়ে যেতেন। আমি উল্‌টে পড়িনি বটে, কিন্তু···!

যে বাড়ীতে প্রদর্শনী, তার সাম্‌নে প্রাঙ্গনে অনেক বন্ধুক, কামান প্রভৃতি সজ্জিত রয়েছে দেখ্‌লুম। একটি প্রকাণ্ড কামান; সেটি পোর্ট্‌ আর্থারের যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। রুশীয় কেল্লার উপর কত গোলাই বর্ষণ করে থাকবে। কামানটি উঁচু নীচু করা যায় ও মুহূর্ত্ত মধ্যে যে ধারে ইচ্ছা ফেরান যায়। কামানের মুখে গোলা পুরতে লোকের দরকার নেই; যন্ত্র সাহায্যে অতি দ্রুত গোলা পোরা যেতে পারে।

বাটীর মধ্যে অনেক লোক। রমণীও অনেক দেখ্‌লুম। যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদর্শিত হয়েচে। "টর্পীডো", "মাইন্‌," গোলা, তরবারি, বন্ধুক প্রভৃতি। আমাদের মধ্যে একজন কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলেন। দেয়ালের গায়ে কয়েকখানি বড় বড় চিত্রে, রুশো-জাপান ও চীন জাপান যুদ্ধের বিষয় অঙ্কিত ছিল। একখানি লোহার খাট দেখ্‌লুম। এটি সাধারণ লোহার খাটেরই মত; তবে এখানির

উপর রুশেদের সেনাপতি কুরোপ্যাট্‌কিন্‌, যিনি যুদ্ধে হেরে পালিয়ে বাহবা পেয়েচেন, শয়ন কর্‌তেন।

যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন শীতের ধূসর সন্ধ্যা চারিদিকে একটা নিরানন্দভাব ছড়িয়ে দিয়েচে। দোকানে পসারে আলো জ্বালা হয়েচে। সাম্‌নে একটু আগুন নিয়ে দোকানি হাত গরম কর্‌চে। রাস্তায় লোকগুলো শীতে হিস্‌ হিস্‌ করতে করতে দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলেচে। মাঝে মাঝে পাহারাওয়ালা গলা পর্য্যন্ত ওভারকোট দিয়ে ঢেকে পায়চারি কর্‌চে।

নূতন দেশে এসে, নূতন জিনিষ দেখে মনে কত নূতন ভাবনার উদয় হ'ল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে লেপের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি মেরে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লুম জানি না।

রাজধানী।

জাপান সাম্রাজ্যের রাজধানী, কথাটা শুনিলেই একটা বিরাট্ ভাব মনে জাগে। কিন্তু তোকিও সহরে, আয়তন ছাড়া আর কিছুতেই বিরাটত্ব নাই। ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যশ্রেণী নাই; সহরের রাস্তা জনকোলাহল বা রথচক্র-শব্দ মুখরিত নয়। ছিন্ন বস্ত্র বা বিবস্ত্র, পাদুকাহীন, ও অন্নাভাবে অস্থিসম্বল ভিক্ষুক রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় না। বিভূতিভূষিত, লোটাকম্বলধারী, তিলককাটা পেষাদার "ভিক্ষুক"ও নাই। কারণ, যার হাত পা আছে সে খাটিয়া খায়, ও ভিক্ষাবৃত্তিতে আত্মসম্মানের লাঘব হয় ইহাই এ দেশবাসীর বিশ্বাস। পুলিসে কা'কেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেয় না,—অন্ধ বা পঙ্গু, যারা নিতান্ত নিঃসহায়, সরকার তাদের ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন,—আর এদেশের লোকেরাও শিক্ষিত, তাই ভণ্ড সন্ন্যাসীকে আহারাদি করাইয়া বা অনাবশ্যক অর্থদানে পরিতৃপ্ত করিয়া "স্বর্গের পথ" পরিষ্কার করে না। আমাদের দেশটা ভিক্ষুকের দেশ। কারণ হচ্চে শিক্ষাভাববশত জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বার্থে ঔদাসীন্য, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য ও অর্থকরী যাবতীয় ব্যবসায় বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালনা।

বস্তুত এখানে এমন একটা নীরবতা ও শান্তি আছে যা গ্রাম্যোপযোগী, কিন্তু অন্যান্য দেশের সহরে অবর্ত্তমান।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এস্থান একটি সুবিস্তীর্ণ অগভীর হ্রদের প্রবেশ দ্বারে কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তন গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল। এবং

সেই হেতু এ প্রদেশ "য়েদো" বা "জলের প্রবেশ দ্বার" এই নামে পুরা-কালে খ্যাত ছিল। ১৬০০ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৬৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এ স্থানটি তোকুগাওয়া ষোগুনের রাজধানী ছিল ও প্রত্যেক "দাইমিও" বা ভূম্যধিকারীকে এখানে এক একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতে হইত। এখান থেকে বিভিন্ন প্রদেশ শাসিত হওয়াতে স্ব স্ব জমিদারের কার্য্যে নিযুক্ত সকল প্রদেশেরই লোক এখানে দেখা যাইত। ইহা হইতে প্রমাণ হবে তোকিও বহু পূর্ব্ব হতে একটি সমৃদ্ধ নগরী।

সহরের জনসংখ্যা ১,৮১৮,৬৫৫। উত্তর হতে দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল, ও পূর্ব্ব হতে পশ্চিম প্রস্থে ৬½ মাইল। আয়তন ২৮ বর্গ মাইল। সহরটি ১৫টি জেলায় বিভক্ত। ১৮৬৮ সালে যখন রাজসভা কিয়োতো হতে উঠিয়া আসে তখন পুরাতন নাম "য়েদো" পরিবর্ত্তিত হয়ে "তোকিও" বা "পূর্ব্বদেশীয় রাজধানী" হইল।

তোকিওকে সহর না ব'লে বোধ হয় কতকগুলি বৃহৎ গ্রামের সমষ্টি বলাই ঠিক। বসতবাটী, দোকানঘর প্রভৃতিতে সহরে ঘেঁসাঘেঁসি ভাব নাই। প্রায় প্রত্যেক বাটীরই সাম্‌নে একটুখানি খোলা স্থান ও তাতে দু চারটে গাছপালা আছে। রাস্তাগুলি বিস্তৃত, তবে অবস্থা বড়ই খারাপ। ফুটপাত নাই। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অতি দীর্ঘ কাষ্ঠের স্তম্ভ দণ্ডায়মান। এগুলিতে টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের তার সংযুক্ত আছে। বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীর স্তম্ভ ব্যতীত অন্য কোন স্তম্ভই ধাতু নির্ম্মিত নয়। নানাজাতীয় বিপনিশ্রেণী, সম্মুখে বিচিত্র অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন। বিদেশী সৌখীন জিনিষের দোকান সর্ব্বত্র। "হ্যাট্", "কলার", "টাই", মোজা, ছড়ি, কম্বল, "সার্ট্", রুমাল প্রভৃতি যাবতীয়

"সাহেবী" জিনিষ এই দোকানগুলিতে বিক্রয় হয়। এ সব দোকানের বিজ্ঞাপনগুলিও ইংরাজিতে লিখিত, তবে অধিকাংশ স্থলেই ভাষাটা একটু আজগবী ধরণের। কয়েকটি উদাহরণ দিই : Rugs and Bugs হবে Rugs and Bags, Mirk Hore হবে Milk Hall, Europe of Confectionary হবে European Confectionary, Kaks and Bisketts হবে Cakes and Biscuits.

অনেক দোকানেই রমণী বিক্রেত্রী, বিশেষতঃ পিক্‌টোরিয়্যাল্ বা চিত্রিত কার্ড্ ও সিগ্‌রেটের দোকানে। ডাকঘর, ধনাগার প্রভৃতিতেও অনেক রমণী কার্য্য করেন। ধরুন, কিছু খরিদ্ কর্‌বার জন্য একটা দোকানে প্রবেশ কল্লেন। চারদিক থেকে দোকানের লোকগুলি সমস্বরে "ষাই-ই-ই" বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল। আপনি যদি নবাগত হন ত এমন কি ভয় পেতে পারেন। কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, কথাটা হচ্চে "ইরাষ্‌ষাই" অর্থাৎ আসুন। এই কথাটি সংক্ষিপ্ত হয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী আকার ধারণ করেচে। জিনিষ কিনে বহিরাগমনের সময় আবার চীৎকার, "দোম্যা......স্"। একথাটির আদিম আকার বেশ দীর্ঘ, "দোমো আরিগাতো গোজাইমাস্" অর্থাৎ ধন্যবাদ মহাশয় বা মহাশয়া। জাপানীরা খুব কাজের লোক, কথাটাও বলা চাই সময় বাঁচানও দরকার। তাই যার আকার ছিল সর্পের মত, এদের হাতে পড়ে হল কেঁচো!

উপরোক্ত কথাগুলো ব'লে ব'লে দোকানদার এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে যায়। খরিদ্দারও ঢুক্‌ল আর দোকানদাররূপ মানুষ কলের মুখ থেকে বেরুল "ষাই-ই-ই-"। সর্ব্বত্রই এইরূপ, নাপিতের দোকানেই যান বা ভোজনালয়েই যান।

দোকানের কথা লিখতে "মিৎসুকোষির" কথা মনে পড়ে গেল। এটি আমেরিকান্ আদর্শে পরিচালিত রাজধানীর শ্রেষ্ঠ দোকান। জাপানী রেশমই প্রধান বিক্রেয় দ্রব্য। তা ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় সর্ব্ব-প্রকার জিনিষই পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত মহিলারা এখানে স্বামীর বা পিতার অর্থ খরচ করতে আসেন। দোকানের অভ্যন্তর অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। কার্য্যের শৃঙ্খলাও প্রশংসার্হ। অতি দীন হীন ব্যক্তিরও দোকানে ঢুকিবার বাধা নাই। অনেকে কেবল বেড়াতে যান, ও দোকানের মধুর ঐক্যতান বাদন শুনে পরিতৃপ্ত হন। এটি সহরের একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। অনেক শিক্ষিতা সুন্দরী রমণী বিক্রেত্রী আছেন। এই দোকানের মধ্যে ফোটোগ্রাফারের দোকান, মুচির দোকান, ষ্টেসনারি বিভাগ, দরজির দোকান, স্বর্ণ, রৌপ্য, জহরৎ প্রভৃতির দোকান আছে। ভদ্রলোক ও মহিলাদিগের যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ বা সখের জিনিষ বিক্রিত হয়।

এদেশে দেখি সবই যেন ঘরোয়া কাণ্ড। রাস্তায় জল দিবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। প্রায়ই দেখা যায় দোকানদার তার দোকানের সম্মুখে, বা গৃহস্থ তার বাটীর সাম্‌নে ছোট বাল্‌তি করে জল ছড়াচ্ছে। সেই জল নিকটস্থ খোলা ড্রেন থেকে তখনি তখনি উঠিয়ে নিচ্ছে। সহরের যে দিক্‌টা "ফ্যাসানেবল্" সেখানকার রাস্তায় মান্ধাতার আমলের গাড়ীতে জল ভ'রে একটা লোক টেনে নিয়ে বেড়ায়। কতক অংশে জল পড়ে, কতক অংশে পড়ে না। এইরূপে কাদা ও ধূলা উভয়েরই সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত বা বরফ পাতের পর রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। অনেকটা দধি বা ক্ষীর সমুদ্রের মত! তার উপর অবিরাম

কাষ্ঠপাদুকার যাতায়াতে কর্দ্দমের আশু তিরোভাবের আশা সুদূর পরাহত হয়। বৃষ্টিপাত বা বরফপাতের পরিমাপ হিসাবে জাপানীদের কাষ্ঠপাদুকা উচ্চ হতে উচ্চতর হয়, তাই তাদের কোন কষ্টই নেই, যত কষ্ট জুতাপরা "অসভ্য" বিদেশীর।

রাস্তায় কিন্তু কখন ময়লা জমা করে রাখা হয় না।

রাস্তা মেরামতের উপায়টিও মনোরম! যেখানে মেরামত দরকার সেখানে কয়েকটা লোকে একগাড়ী খোয়া ফেলিয়া দিল। কোদালি সাহায্যে সে গুলো একটু ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বস্, খালাস। লোক হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে খোয়াগুলো বসে যাবে! জুতার তলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় হোক্ না কেন, রাস্তা ত মেরামত হল! দুএকবার সহরে বিষম ছোট "ষ্টীম রোলার" দেখেছিলুম, তার পর তারা যে কোথায় অদৃশ্য হল কোন কিনারা হয় নি।

অথচ "মুনিসিপ্যালিটি" আছে এমন কি লণ্ডনের মত "মেয়র" ও আছে! রাস্তায় অশ্বযানের বড়ই অভাব। অশ্বযান কেন, সর্ব্বপ্রকার চতুষ্পদ জন্তুযানেরই অভাব। যাঁহারা খুব ধনী তাঁহাদের অশ্বযান আছে, কাহারও বা "অটোমোবিল" আছে। কিন্তু এগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। রাস্তায় ক্বচিৎ যখন একখানা ঘোড়ার গাড়ী বা অটোমোবিল দেখা যায়, পথিকেরা বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে চেয়ে থাকে, ও স্বদেশের সমৃদ্ধি দেখে মনে বিপুল পুলকানুভব করে। বাইসিক্‌ল্ বা দ্বিচক্রযানের চল্‌তি খুব। রাস্তায় পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে শত শত গাড়ী দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকেই এক একখানা গাড়ী রাখে। ছোট ছোট ছোক্‌রারা পৃষ্ঠে গুরুভার বস্তা বেঁধে কেমন দক্ষতা সহকারে গাড়ীগুলি চালায় দেখ্‌লে

বিস্মিত হতে হয়। অনেক সময়ে আরোহীর পদদ্বয়ের খর্ব্বতাহেতু "প্যাড্‌ল্‌" বা পাদানিতে পা পৌঁছায় না, এমন অবস্থায় ছোক্‌রারা গদির উপর না বসে নিম্নস্থ দণ্ডের উপর বসে গাড়ী চালায়। সহরটি সমতল নয়। যেমন জাপানের সর্ব্বত্র, এখানেও তেমনি কোন অংশ খুব উঁচু আবার কোথাও বা নীচু। রাস্তা সমতল হলে বিশেষ কষ্ট নাই কিন্তু অসমান জমির উপর দ্বিচক্রযান চালান সমূহ কষ্টসাধ্য। বাল্যকাল হতে অভ্যাস করে এরা দ্বিচক্রযানারোহনে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। পুরুষের মধ্যে শতকরা আশি জন বোধ হয় দ্বিচক্রযান ব্যবহারে সক্ষম।

অশ্বযানের অভাব হলেও মনুষ্যযানের অভাব নেই। কত রকম! প্রথম হ'ল রিক্‌স, যাতে মানুষ চড়ে বেড়ায়। বাটীতে একখানা রিক্‌স রাখা খুব বড়মানুষী। ঘোড়ার বদলে একটি লোক নিযুক্ত করে রাখ্‌তে হয়। খাওয়া পরা ও মাসিক পনের টাকা বেতনে লোক পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের, যথা গোয়ালা, তেলি, মুচি; বিস্কিট্‌ওয়ালা, শাকসব্‌জি-ওয়ালা, চালওয়ালা প্রভৃতির প্রত্যেকেরই গাড়ী আছে। এ গাড়ী গুলি প্রায় একই ধরণের। একটি চতুষ্কোন বাক্সের দুধারে দুইখানি চাকা লাগান। বাক্সের ডালা আছে, চাবি কুলুপও আছে। বাক্সের মধ্যে জিনিষপত্র ভরে এক একটা আহাম্মক ধরণের ছোক্‌রা টেনে নিয়ে বেড়ায়। গৃহস্থকে প্রত্যহ প্রাতে এইরূপে যোগান দিয়া থাকে।

দিনের বেলায় যখন তখন যেখানে সেখানে বিষ্ঠার গাড়ী দেখা যায়। ঐ গাড়ীগুলিও মানুষে টানে। এখানে ড্রেনের পাইখানার ব্যবস্থা নাই। মনুষ্যের মল এখানে জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কৃষকেরা সহর হতে বিষ্ঠা লইয়া যায়। মেথরদের নিকট মূল্য দিয়া খরিদ করে।

এখানে পাইখানা পরিষ্কারের জন্য গৃহস্থের কোন খরচ নাই! রাস্তায় রাস্তায় মেথরেরা গাড়ী নিয়ে হেঁকে যায়, যখন ইচ্ছা ডাক্‌লেই হ'ল।

ট্রামগাড়ীর আজ কাল খুব চলন হয়েচে। ভাড়া বেশ সস্তা, এক টিকিটে যতবার ইচ্ছা গাড়ী বদল করা যায়। এখানকার ট্রামগাড়ীতে শ্রেণীবিভাগ নাই; মুটে, মজুর, ভদ্রলোক; রমণী ও পুরুষ সবাই একত্রে যাতায়াত করেন। সহরটি অতি প্রকাণ্ড, তাই স্ব স্ব কর্মস্থানে যেতে সকলকে ট্রাম ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দেশে ট্রামগাড়ীতে যেমন একটি লম্বা ফুট্‌বোর্ড্ বা পাদানি আছে, এখানে সেরূপ নয়। তিন চারিটি প্রবেশ দ্বারও নাই। এখানে কেবল দুটি প্রবেশ দ্বার, একটি পশ্চাতে যেখানে কণ্ডাক্টর দাঁড়ায়, ও অপরটি যেখানে ট্রামচালক দাঁড়ায়, সম্মুখে। প্রত্যেক আরোহী নামিবার সময় এ দুটি দ্বারের কোন একটি দিয়া নামে ও ঐ সময় টিকিটখানি দিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা থাকাতে ট্রামকর্তৃপক্ষের টিকিট সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয়, ও স্বতন্ত্র টিকিট পরীক্ষকের দরকার হয় না। ভোর হতে ট্রাম চল্‌তে আরম্ভ হয় ও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত চলে। প্রাতে যখন কার্য্যারম্ভ হয় ও সন্ধ্যায় দিবসের কার্য্যাবসানে ট্রামে অত্যধিক ভিড় হয়। যত লোক বসিতে পারে বসে, বাদবাকী সকলে চামড়া বা বেতের হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়ায়।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামে। সেখানে আরোহীরা ওঠা নামা করে। এসকল স্থানের স্তম্ভগুলি লোহিতবর্ণে চিত্রিত। অন্যান্য স্তম্ভগুলির সবুজ রঙ্। রাত্রে লোহিতবর্ণে চিত্রিত স্তম্ভগুলির উপর লোহিতালোক জ্বলে। আরোহীদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে গাড়ী থামে না।

য়োকোহামা ও তোকিওর মধ্যে যে ট্রাম গাড়ী, তা খুব দ্রুত চলে। আকারও সাধারণ ট্রামগাড়ীর চেয়ে বড়। ভাড়া ট্রেনের চেয়ে সস্তা।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ট্রামগাড়ীতে জাপানী চরিত্রের বেশ একটু আভাস পাওয়া যায়।

অক্টোবর মাস। বেশ একটু শীত পড়েচে। প্রাতে আপনি ট্রামে উঠলেন। উঠে দেখেন ট্রামখানি প্রায় পূর্ণ। একটা জায়গা ছিল সেখানে বসে পড়লেন। চারিদিকে চেয়ে দেখেন অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা জাপানী পুরুষ। এরি মধ্যে শীতবস্ত্র যা কিছু ছিল সব পরেচেন, ওভারকোটটি বাদ দেন নি, গলায় একটা কম্ফর্টর্। ভয়, পাছে ঠাণ্ডা লাগে! (এরাই আবার ভারতবাসী দেখলেই জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের দেশ ত বড় গরম! ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাও, না?) এঁরা প্রাতঃকালীন আহারের সময় যে মূলা ভক্ষণ করেচেন তার দুর্গন্ধে গাড়ী পূর্ণ। আর একটা কারণ আছে। অনেকেই এক একটা দাঁতখোঁটা বা খড়্‌কে নিয়ে দাঁত খুঁটচেন ও মধ্যে মধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ করে দশনরন্ধ্র-প্রবিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট মূলার রসাস্বাদনে ব্যস্ত। ছেলেবেলা থেকে জানি গিলিতচর্ব্বণ করা গো মহিষাদিরই স্বভাব। এখানে এসে একটু নূতন জ্ঞানলাভ হয়েচে!

ইতি মধ্যে আর এক দল আরোহী উঠেচে। একটা বসিবার স্থানের জন্য তারা ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করচে। গাড়ী ছাড়িল। সেই ঈষৎ হাঁচ্‌কা টানে দণ্ডায়মানদের মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত। এ উহার ঘাড়ে পড়ে, আবার সে আর একজনের ঘাড়ে পড়ে। কারও স্থৈর্য্য নাই, সকলেই অস্থির! গণ্ডগোলের মধ্যে এক পুরুষ উপবিষ্টা

এক সুন্দরীর ঘাড়ে পড়্লেন. কাষ্ঠ পাদুকার ঘর্ষণে তাঁর শ্বেত পদাবরণ মলিন হইল। সুন্দরী একবার উপরের দিকে চাইলেন, পুরুষটি তখন সাম্লিয়ে নিয়েচে। এইখানেই শেষ!

পূর্ব্বে বলেচি এখানে সব ঘরোয়া কাণ্ড। জাতিটি যেন একটি প্রকাণ্ড পরিবার, সকলেই সকলকে সাহায্য করিতে তৎপর। ট্রামে স্থান নাই, লোক ঠেসাঠেসি। তবুও নূতন আরোহী উঠ্চে। কেহ কোনরূপ আপত্তি বা অসুবিধা হচ্চে বলে অভিযোগ করিবে না। আর আমাদের দেশে? কতবার দেখেচি ট্রেণ ছেড়ে যাচ্চে, আমাদেরই দেশবাসী একজন ছুটে গাড়ীতে উঠ্তে এসেচে, আর যাঁরা গাড়ীর অভ্যন্তরে, তাঁরা দুয়ার আগ্লে সেখান থেকে বলচেন, এ দেড়া মাশুলের গাড়ী, এখানে নয়! যদিই বা তার দেড়া মাশুলের টিকিট থাকে ত বলচেন, গাড়ীতে জায়গা নেই, অন্য গাড়ী খুঁজে নাও। ইত্যবসরে গাড়ী ছেড়ে দিল, তার আর সে গাড়ীতে যাওয়া হল না। হয় ত ঘরে স্নেহময়ী মাতা বা প্রিয়তমা পত্নীর বিষম ব্যারাম, সে গাড়ীতে যেতে না পেরে শেষ দেখা হল না! কিন্তু আমাদের পাষাণ হৃদয় গলে কই! একটু আরাম একটু স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়ে আমারি দেশের একজনের একটু সুবিধা করে দিব, এ চিন্তা আমাদের নাই।

যাক্। ট্রামগাড়ীতে জুতা পরিষ্কার থাকা অসম্ভব। ৩ চারবার কাষ্ঠ পাদুকার দ্বারা মর্দ্দিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা। বসে থাক্তে থাক্তে দেখ্লেন, একটি রমণী গাড়ীতে উঠে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়েচেন, জাপানী পুরুষেরা কেহই তাঁকে লক্ষ্য করিলেন না। স্ব স্ব আসনে "গ্যাঁট" হয়ে বসে রইলেন। রমণী বই ত নয়, দাঁড়িয়ে উঠে নিজের

জাপান।

জায়গাটি দিবার দরকার কি? পুরুষ প্রভু, রমণী ত তার ভৃত্য! (জাপানী রমণীর অধিকার কতক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রমণীর অপেক্ষা অধিক হলেও এখনও তাহাদের স্থান পুরুষের নিম্নে। য়ুরোপীয়েরা যেমন রমণীমাত্রেরই সুবিধার জন্য ব্যস্ত, এখানে সেরূপ নয়) দেখ্‌লেন রমণীটি দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, তাই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে আপনার স্থানে বসিবার জন্য অনুরোধ করলেন। রমণীরা স্বভাবতই শান্তপ্রকৃতি, বিশেষত এসিয়াবাসী রমণী। আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'ল। ইত্যবসরে কোথা থেকে এক জাপানী পুরুষ ছুটে এসে জায়গাটি দখল করে বস্‌লেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌ল, যেন এই ভাব, আঃ বাঁচা গেল একটা জায়গা পাওয়া গেছে!

এরূপ দৃশ্য অহরহ দেখ্‌বেন। এ বিষয়ে জাপানী পুরুষ একান্ত স্বার্থপর। এই অতি ভদ্র জাতির নজরে এ বিষয় একেবারেই পড়ে না, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। একবার জনৈক ভারতবাসী ট্রাম-গাড়ীতে একটি রমণীকে নিজের স্থান প্রদান করেন ও স্বাভাবিক নিয়মে একটি স্থানান্বেষী পুরুষ কর্তৃক উহা অধিকৃত হয়। তিনি ভাষা জানিতেন না, তাই ইংরাজিতে লোকটিকে বলেন—এস্থান রমণীটির জন্য দিয়াছি তোমার জন্য নয়; ও তৎপরে লোকটিকে উঠাইয়া দিয়া রমণীটিকে বসাইয়া দেন। আরোহীরা হাস্য করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত শাস্তি!

অনেক সময় দেখা যায় এক বৃদ্ধা উঠেচেন, পুরুষেরা কেউ উঠ্‌লেন না দেখে যুবতী রমণী বা স্কুলের বালিকা উঠে নিজের জায়গাটি তাঁকে দিলেন। করুণ রমণী-হৃদয় কি না! ট্রামের কণ্ডাক্টর্ প্রত্যেক ষ্টেসন আসিবার পূর্ব্বে উচ্চস্বরে আগামী ষ্টেসনের নাম বলে দেয়। কতকগুলি

বাঁধা গৎ আছে। বহুদিনের অভ্যাসে সে কথাগুলি বলিতে কোন চিন্তা করিতে হয় না, আপনা আপনি বাহির হয়ে যায়। ষ্টেসন থেকে গাড়ী ছাড়্লেই ইহারা চীৎকার করিল : একটু আগে আগে ঢুকিয়া যান, পিছনের লোক ঢুকিতে পারিতেছে না, ঐ-ত হ্যাণ্ডেল্ খালি রয়েচে, এগিয়ে গিয়ে ঐটি ধরুণ নইলে পশ্চাতের লোক ঢুকিতে পারে না। গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া : কার কার টিকিট নিতে হবে? আরোহীর নিকট থেকে পয়সা লইয়া, দশ পয়সা ; কোথায় গাড়ি বদল করবেন? এই নিন ১ পয়সা ফেরত। অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আপনার টিকিট? ইতিমধ্যে পরের ষ্টেসন নিকটবর্ত্তী হ'ল, দ্রুতপদবিক্ষেপে কণ্ডাক্টর দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁকিল, এইবার অমুক জায়গা, সাড়া না দিলে গাড়ী থাম্‌বে না, তাড়াতাড়ি নেই গাড়ী থাম্‌লে আস্তে আস্তে নামুন, জিনিষপত্র যেন ভুলে ফেলে যাবেন না। আরোহীরা নামিল, উঠিল। টিং টিং করে দড়ি টেনে দুইবার ঘণ্টা বাজিয়ে কণ্ডাক্টর বলিল, এইবার যাবে। গাড়ী চলিল।

সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান জাপানীরা এ ওর গায়ে হেলে পড়িল, একজন তার ধূলাবৃত "গেতা" দিয়ে আমার চক্‌চকে জুতা মাড়িয়ে দেওয়াতে ক্রোধে ও দুঃখে অশ্রুসংবরণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল!

স্ত্রীলোকদিগের সমক্ষে পুরুষের ব্যবহার সংযত ও শিষ্ট হওয়া দরকার, অধিকাংশ জাপানী পুরুষ তাঁহাদের ব্যবহারে, বিশেষত ট্রামগাড়ীর মধ্যে, এ নীতি লঙ্ঘন করেন। অনেক সময়ে, গ্রীষ্মকালে দেখা যায় ইহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিধেয় বস্ত্রে যথাযোগ্য ভাবে আবৃত রাখে না। সর্ব্বপ্রকারে রমণীর অগ্রবর্ত্তী হতে হবে এ ভাবটা মন থেকে বিদায় দিতে পারেন নি।

পত্নীকে লইয়া হয় ত গাড়ীতে উঠিতেছেন, কোথায় পত্নীর একটু কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করবেন তা নয়, তাঁহার হস্তেই পুলিন্দা বা শিশুকে দিয়া আপনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে পড়্লেন। পত্নী পশ্চাতে ভিড় ঠেলিয়া উঠুক না কেন!··

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়্ল। ট্রামে বসে আছি, পার্শ্বেই এক জাপানী। মুখ দেখে লোকটা বুদ্ধিমান কি নির্ব্বোধ কিছুই বোঝা যায় না। মুখে মনের ভাব প্রকাশ, এ জাপানীর শাস্ত্রে লেখেনা। বরং বিপরীত ভাব প্রকাশেই ইহারা বাল্যকাল হতে শিক্ষিত। ক্রোধ হইলে মুখে হাস্য ফুটে উঠ্বে, ক্রোধের কোন লক্ষণই প্রকাশ হবে না।

পার্শ্ববর্ত্তী লোকটি জাপানী-ইংরাজীতে বলিলেন: "Sir, you Indian?"—মহাশয় আপনি ভারতবাসী?

আজ্ঞে হাঁ।

"Where you go?"—কোথায় যাচ্চেন?

অমুক জায়গায় যাচ্চি।

মনে হয় বলি, আমি যেথায় যাই না কেন, তোমার তাতে কি বাপু? কিন্তু কিছুদিন এদেশে থাকিলে প্রায় প্রত্যহই অজানিত লোকে এরূপ প্রশ্ন করে দেখে বিরক্তির পরিবর্ত্তে হাস্যের উদ্রেক হয়।

তাহার পর তিনি বলিলেন: "Teach me English," আমাকে ইংরাজি শিখান। তখনি তখনি ইংরাজি ভাষায় তাহাকে পণ্ডিত করে দিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তির অভাবে মৌনাবলম্বন করলুম। দুই তিন মিনিট পরে তিনি টুপি খুলে সেলাম করে বল্লেন: গুড বাই। জাপানীর

জিহ্বা থেকে ড বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। ইহারা ড স্থানে দ ও ল স্থানে র উচ্চারণ করে। "লেডি" কে বলে "রেদি"।

ছেলে, বুড়ো, চাষা, রাজা সকলেই ইংরাজি শিখিতে পাগল।

শিক্ষা করিতে হইলে অনুসন্ধিৎসু হওয়া দরকার স্বীকার করি, কিন্তু এ দেশের লোক এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেন। রাস্তা দিয়া দুইজনে চল্‌চি। কথাবার্ত্তা বাঙ্‌লাতে চালাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটি ছাত্র আমাদের সঙ্গ নিয়েচে। মুখের দিকে চেয়ে সে মাইল খানেক সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল, কেন না তাকে শুনতে হবে আমরা কোন ভাষায় কথাবার্ত্তা কইচি। কিছুক্ষণ পরে হয়ত টুপি খুলে সেলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন: Do you know Mr. Lao? আপনি মিঃ রাওকে জানেন? তিনি আমার "বেশ্‌তো ফ্রেন্দ্‌," অর্থাৎ Best friend বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

উত্তর দিলুম, জানি। জিজ্ঞাসা করলুম, তাঁর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হ'ল?

"একদিন ট্রামের মধ্যে দেখা হয়েছিল।"

"তারপর?"

"তারপর আর দেখা হয়নি।"

হঠাৎ ট্রামের মধ্যে দেখা হয়েছিল তাই একেবারে "বেশ্‌তো ফ্রেন্দ্‌!" কথাটা আর কিছু নয়। ছাত্রটি সম্প্রতি ইস্কুলে Best friend, এ দুটি কথা শিখেচেন তাই একবার ব্যবহার করে "ঝালিয়ে" নিলেন।

হ'লই বা অপব্যবহার!

এক চাষা নাকি কোন পণ্ডিতের কাছে "কতিপয়" এই শুদ্ধ কথাটি শিখেছিল। কিছুদিন পরে কোন লেখাপড়া জানা লোককে দিয়া পিতা-

ঠাকুরকে একখানি পত্র লিখাইল। পত্র শেষ হলে বলিল—মশায়, শেষে "কত্তিপয়" কথাটা লিখে দিন ত। পত্র লেখক বলিল, "কতিপয়" কথাটা লেখা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উত্তর হইল, হোক্ না কেন, লিখে-দিন কথাটা ভাল!

এইবার সহরের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করি। রাস্তার মধ্যে মধ্যে পুলীসের কন্‌ষ্টেবলদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের কুঠ্‌রী আছে।

পুলীসের কুঠ্‌রী। (ছবির বামদিকে)

রাত্রে কুঠ্‌রীর সম্মুখে লাল আলো জ্বলে। তাহার মধ্যে একখানা সেই অঞ্চলের মানচিত্র, বাসিন্দার নাম ও ঠিকানা থাকে। প্রত্যেক কুঠ্‌রীতেই টেলিফোন আছে। কন্‌ষ্টেবলেরা সর্ব্বপ্রকারে জন সাধারণের সাহায্যে প্রস্তুত। পুলীশ জন সাধারণের কর্ম্মচারী, (Public servant) সেহেতু

সর্ব্বদা জনসাধারণের প্রতি তাদের ব্যবহার শিষ্টাচার সম্মত। অ্যাড্-মিরাল্ তোগোর তোকিও প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, প্রিন্স্ ইতোর শব-যাত্রায়, ও হিরোশের প্রস্তরমূর্ত্তি উন্মোচনের সময় ২-৩ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা একত্র হলেও পুলীসকে জনতার প্রতি কখনো কোনো প্রকার রুক্ষ ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তারা কর্ত্তব্য পালনে সত্যানুরাগ, বিচক্ষণতা, ও সদ্বিবেচনার পরিচয় দেয়। এখানে ইহারা রুলের পরিবর্ত্তে তরবারি ঝুলাইলেও উহা সর্ব্বদা কোষ নিবদ্ধই থাকে, কখনো ব্যবহৃত হয় না।

বিগত রুশো-জাপান যুদ্ধের অবসানে পোর্ট্ স্মাউথে সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে এখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কারণ তাহারা সন্ধির ধারাগুলির অনুমোদন করে নাই। তাহাতে জাপানের সম্মান লাঘব হয়েছিল ব'লে তাদের বিশ্বাস ছিল। এ সময়ে পুলীস কিছু অন্যায় অত্যাচার করাতে জনসাধারণের ক্রোধ পুলীসের উপর নিপতিত হয়। একরাত্রে তাহারা পুলীসের যাবতীয় কুঠরীগুলি অগ্নি সংযোগে জ্বালাইয়া দেয়। তাহার পর পুলীস সরকার কর্ত্তৃক বাধ্য হয়ে জনসাধারণের সহিত সংযত ব্যবহার করে।

এখানে পুলীসের নিকট যে কেহ রাস্তা বা কাহারও বাটীর অনুসন্ধান করে তাহাকে ইহারা যথাসম্ভব সাহায্য করে, প্রকৃত রাস্তা বা বাটী দেখাইয়া দেয়। রাস্তা বা বাটী সে অঞ্চলে না হইলে টেলিফোন্‌যোগে অন্য কোথাও জিজ্ঞাসা করে খবর সংগ্রহ করে দেয়।

এখানে ঘরে ঘরে লোকে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করে। প্রায় সর্ব্বত্রই কলের জলের বন্দোবস্ত আছে। রাজধানীর কথা ছাড়িয়া দিই, অতি ক্ষুদ্রপল্লিতে গিয়া দেখেছি ক্ষুদ্র জাপানী হোটেলগুলি বৈদ্যুতিক

আলোকোদ্ভাসিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই টেলিফোন আছে। ইহাতে কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা হয়। প্রত্যেক দোকানে, অতি নগণ্য দোকান ছাড়া, টেলিফোন সংযুক্ত আছে। গৃহস্থ ঘরে বসিয়া, টেলিফোন যোগে কথা ব'লে, খাদ্যদ্রব্যাদি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ আনাইয়া লইতে পারেন।

. যাদের বাটীতে টেলিফোন নাই তাদের জন্য প্রতি রাস্তায় সাধারণ টেলিফোন আছে। ছোট ছোট কুঠ্‌রী অনেকটা পুলীশ কুঠ্‌রীর মত। প্রয়োজন হলে যে কেহ ভিতরে গিয়া যন্ত্রের নল কানে লাগাইয়া, টেলিফোন সংলগ্ন হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দেন। প্রধান টেলিফোন আফিস থেকে তখন জিজ্ঞাসা করে, কি চাও? আপনি যে নম্বর টেলিফোন চান তা উল্লেখ করলে টেলিফোন সংযুক্ত বাক্সের মধ্যে এক টুকরা "৫ পয়সা" ফেলিয়া দিতে বলিবে। বাক্সের অভ্যন্তরে "পাঁচ পয়সার" টুক্‌রা পড়িলেই আফিসে যন্ত্র সাহায্যে বুঝ্‌তে পারে আপনি পয়সা দিলেন। তৎপরে পাঁচ মিনিট অভীষ্ট যায়গায় কথা কইতে পারেন। পাঁচ মিনিট পূর্ণ হলে সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। পুনরায় বলতে চাইলে আবার "৫ পয়সা" দিতে হয়।

প্রায় প্রত্যেক রাস্তাতে রেষ্টোর্‌্যাং বা ভোজনালয় ও ফোটোগ্রাফ্ বা আলোকচিত্রের দোকান। দিন দিন এদেশে য়ুরোপীয় খাদ্যের আদর বাড়িতেছে। স্ত্রী, পুরুষ সকলেই মধ্যে মধ্যে য়ুরোপীয় খাদ্যে মুখ বদ্‌লাইয়া থাকেন। আমাদের দেশের তুলনায় এখানে য়ুরোপীয় খাদ্য বড়ই মহার্ঘ। "রাইস্ কারি" ভারতবর্ষীয় জিনিষ ইহা সকলেই জানেন; ও ভারতীয় খাদ্য দ্রব্যের প্রসঙ্গ উঠ্‌লেই, তোমাদের "রাইস্ কারি"

খেয়েচি ও খুব পছন্দ করি ব'লে আমাদের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেন। উৎসবের দিন বা ছুটির দিন সহরের প্রধান ভোজনালয়গুলি স্ত্রী পুরুষে পূর্ণ থাকে। অনেক স্থলে সুন্দরী পরিচারিকারা খাদ্যাদি পরিবেষণ করে।

ভোজনালয় ছাড়া Milk Hall, Beer Hall প্রভৃতি সব গলিঘুঁজি-তেই বিদ্যমান। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দুগ্ধ, বীয়ার ও পিষ্টকাদি পাওয়া যায়।

আমেরিকান্ ধরণে সজ্জিত নাপিতের দোকান আছে। আমাদের দেশের মত বাটীতে নাপিত আসিয়া চারি পয়সায় কেশ ও নখ্ কর্ত্তন ও ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে না। নাপিত কাহারও বাটীতে আসে না। সকলকে নাপিতের দোকানে যেতে হয়। একটু ভাল দোকানে কেবল কেশ কর্ত্তন করতে আমাদের দেশের প্রায় চারি আনা খরচ। কোন নাপিতের দোকানেই নখ্ কর্ত্তন করে না। এ কার্য্যটা বাটীতে স্বহস্তেই করতে হয়। নাপিতের দোকানে যেমন খরচ বেশী, তেমনি যথেষ্ট আরাম পাওয়া যায়। নাপিতেরা য়ুরোপীয় পোষাকে সজ্জিত, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনি চেয়ারে বসলেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড আয়না। গলা হইতে পা পর্য্যন্ত এক খণ্ড শ্বেত বস্ত্রে আপনার শরীর ঢাকিয়া, যাহাতে গায়ে একটি কেশও না পড়ে, অতি সাবধানে আপনার কেশ কর্ত্তন করবে। তাহার পর গরম জলে সাবান দ্বারা মাথা উত্তমরূপে ধৌত করে সুগন্ধি জলে কেশ মর্দ্দিত করবে। তৎপরে টেড়ি কাটিয়া দিবে। এই অবসরে আপনি বেশ একটু ঘুমাইয়া লইতে পারেন। বাস্তবিকই সময়ে সময়ে এত আরাম হয় যে না ঘুমাইয়া থাকা যায় না।

এ দেশের লোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লোক-প্রসিদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে স্নানাগার আছে। তা আর কিছু নয় একটা অনতিপ্রশস্ত ঘরে একটা কাঠের চৌবাচ্ছা, তাতে জল গরম হয়। ইহারা গরম জলে স্নান করতে বড় ভালবাসে, এমন কি গ্রীষ্মে যখন গলদ্‌ঘর্ম্ম হয় তখনও ইহারা অত্যুষ্ণ জলের মধ্যে গা ডুবাইয়া বসিয়া থাকে। ক্রমে যখন জলে বসিয়া থাকা আর কষ্টকর বোধ হয় না, অর্থাৎ শরীরের তাপ জলের তাপের সঙ্গে সমান হয়ে যায়, তখন একটা অবসাদ আসে। বেশ আরাম পাওয়া যায়।

প্রতি রাস্তায় সাধারণ স্নানাগার আছে। এখানে সাধারণত দরিদ্র লোক, ও যাহাদের বাটীতে স্নানের বন্দোবস্ত নাই, এমন লোকই আসে। প্রাতঃকাল হতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই স্নানাগারগুলি খোলা থাকে। প্রত্যেকের জন্য দুই, তিন পয়সা লাগে। একটা অতিবৃহৎ চৌবাচ্ছায় জল গরম রাখা হয় তাতে একই সময়ে বহুলোক একত্রে গাত্র ডুবাইয়া বসিয়া থাকে। এ নিয়ম স্বাস্থ্যকর ব'লে বোধ হয় না। বলা বাহুল্য সকলেই উলঙ্গ হয়ে স্নান করে। স্নানের ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে সকলেই পরিধেয় বস্ত্রাদি ছোট ছোট নির্দ্দিষ্ট ঝুড়িতে রেখে যায়। গরম জলের চৌবাচ্ছা হতে বাহির হয়ে ছোট ছোট টুলের উপর বসে গা রগড়াইতে হয়। কয়েকটি চৌবাচ্ছায় শীতল জলও রাখা হয়। যাহার ইচ্ছা সে ব্যবহার করে। উপরি দুই এক পয়সা দিলে স্নানাগারের ভৃত্য গা রগড়াইয়া দেয়।

অন্য একটি ঘরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যবস্থা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একই ঘরে স্ত্রী পুরুষ একত্রে স্নান করিত। আজকাল সহরে সে প্রথা

উঠিয়া গেছে। তবে এখনও কোন কোন গ্রামে ও স্বাস্থ্যনিবাসে হোটেলে মধ্যে মধ্যে এরূপ দৃশ্য দেখা যায়। জাপানীরা স্বাস্থ্যের জন্য যা প্রয়োজন তাহা করিতে অনাবশ্যক লজ্জাবোধ করেন না।

এইবার সহরের দর্শনীয় স্থানগুলির কিছু উল্লেখ করিব। প্রথমেই মনে হয় সম্রাটের প্রাসাদ। সাধারণ লোকে এ প্রাসাদের কিছুই দেখিতে পায় না। প্রাসাদ পরিখাবেষ্টিত, সহরের বক্ষোপরি অধিষ্টিত। বন্য হংস প্রভৃতি পরিখা মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করে না। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে মৃত জাপানী মহাত্মাদের প্রস্তরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। দেবদারুবৃক্ষের হরিদ্বর্ণ পত্রাবলি প্রাঙ্গণে ছায়াবিস্তার করে শান্তি ও সৌন্দর্য্য এনে দিয়েচে।

এই স্থানের নাম "মারুনোউচি"। বিস্তৃত ময়দানের মত, মধ্যে মধ্যে "বামন" গাছ। আড়ম্বরহীনতা হেতুই স্থানটি এত সুন্দর দেখায়। রুশ্ যুদ্ধের অবসানে এইখানে যুদ্ধে অধিকৃত বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত হয়েছিল।

একটি পরিখা উত্তীর্ণ হলেই প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করা যায় না। পরিখার উপর উচ্চ প্রাচীর, তাহার পর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, তাহার পর পরিখা, তদুপরি উচ্চপ্রাচীর, তাহার পর লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রাসাদ ও তন্মধ্যে সম্রাট্। ছেলেবেলায় গল্প শুনতুম পুষ্করিণীর মধ্যে ছোট বাক্স, তার মধ্যে লাল কৌটা, তার মধ্যে আবার কৌটা, এইরূপ অনেকবার, সর্ব্বশেষে সকলের মধ্যে এক কালো ভোম্‌রা। এখানকার সম্রাটকে এই ভোম্‌রার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। বাল্যকালে উপকথার রহস্যাবৃত ভোম্‌রা আমাদের মনে যেমন একটা

অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় জাগিয়ে তুল্‌ত, এখানেও সম্ভবত প্রজাবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থেকে, দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীর ও সুগভীর পরিখাবেষ্টিত সম্রাট জনসাধারণের অশেষ ভক্তি জাগিয়ে তুলেচেন ও মানবজাতির বহু-উর্দ্ধে দেবতাদের সঙ্গে একাশন প্রাপ্ত হয়েচেন।

সহরের মধ্যভাগে রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ পল্লী "কোজিমাচি" নামে খ্যাত। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও সংস্থিতিতে এটি সহরের শ্রেষ্ঠ পল্লী। এখানে সম্ভ্রান্ত জাপানীরা বাস করেন। বিদেশীয় দূতনিবাস, জাপানের পার্লামেণ্ট্‌ বা মহাসভা, বিচারালয় ও সরকারী আফিসাদি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

"আজাবু" ও "আকাশাকা" এ দুটি পল্লীতেও অনেক ভদ্র জাপানীর বাস। তা ছাড়া এখানে সহরের সৈন্যাবাস গুলি অবস্থিত। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সৈন্যেরা কুচ্‌কাওয়াজ্‌ করে, কখন কখন সমস্বরে বিকট চীৎকার করে ও সকলসময়েই বিউগল্‌ বাজায়। আমরা অনেকদিন এ অঞ্চলে ছিলুম। শীতের দিনে ভোরের বেলায় যখন বিছানার আকর্ষণী শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হত, ঠিক তখনই বিউগলের শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। মনে মনে নিদ্রার ব্যাঘাতকারীদিগকে অভিসম্পাত করে উঠে পড়্‌তুম।

সহরের পূর্ব্বদিক দিয়া "সুমিদা" নদী প্রবাহিতা। এদেশীয় লোকেরা আগ্রহাতিশয্যবশত এটিকে "নদী" বল্‌লেও ইহাকে "নালা" বা "খাল" বলাই উচিত। আমাদের দেশের এরূপ ক্ষীণাঙ্গী "নদী"কে পূর্ব্বোক্ত দুটি নামের একটিতে অভিহিত করে, কিন্তু এখানে উল্টা, "নিরস্ত-পাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে!"

সুমিদার পূর্ব্বদিকে "হোন্‌জো" ও "ফুকাগাওয়া" নামক জেলা। এখানে সহরের অধিকাংশ কলকারখানা অবস্থিত। সাধারণত দরিদ্র লোকের বাস। এই স্থান খুব নিম্নে অবস্থিত বলিয়া কয়েকদিন বৃষ্টির পর "ডোবা" তে পরিণত হয়। চিম্‌নির ধোঁয়া, এঞ্জিনের শব্দ, ও "বিচিত্র" জাপানী মজুর ছাড়া আর কিছুই নাই! বড়ই নীরস!

ভুল বল্‌লুম, এ পল্লীতে "রস" যে একেবারেই অবর্ত্তমান তা নয় সুমিদারধারে "মুকোজিমা" নামক স্থান। এপ্রিল্ মাসে, অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে নদীর ধারের গাছগুলিতে 'চেরি' ফুল ফুটে চারিদিকে একটা গোলাপী আভা ছড়িয়ে দেয়। তখন গাছতলায় ভারি মেলা বসে যায়, আর সৌন্দর্য্য ও কোমলতায় 'চেরি' পুষ্পেরই মত, অসংখ্য সুন্দরী সমাগমে স্থানটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। এখানেই রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য দুই একটি ইস্কুলের "বোট্ হাউস্"। প্রতি বৎসর এই সময়ে নদীতে নৌকার বাচ হয়।

কলকারখানাগুলি মানুষের মন পার্থিব বস্তুতে আকৃষ্ট করিতে সহায়তা করিলেও তাদের মনে আধ্যাত্মিকভাব জাগিয়ে তুল্‌বার ব্যবস্থাও অবর্ত্তমান নয়! নিকটেই প্রসিদ্ধ "একোয়িন্" মন্দির। ইহা কিন্তু বলা আবশ্যক, কোন দেবদেবীর জন্য এ স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করে নি। এ স্থান বীর পূজার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর বড় বড় বিখ্যাত পালোয়ানদের কুস্তি হয়। জাপানীরা বীরজাতি, বীরত্বই এদের ধর্ম্ম।

সম্রাটের প্রাসাদের পরেই, "মিকাদো"র উত্তরাধিকারী রাজপুত্রের প্রাসাদ। ইহাও উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে পরিখা নাই, তবে ভিতরে থাকিলেও থাকিতে পারে। রাজকুমারের জন্য

বিদেশীয় ধরনে সম্প্রতি একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েচে। ইহাই নাকি জাপানের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। রাজকুমার কিন্তু এতাবৎকাল যেখানে বাস করিতেছিলেন সেইখানেই আছেন। নূতন প্রাসাদটি নাকি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বিরাট্‌!

বিচারালয়, ধনাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্টালিকা ও কয়েকটি সরকারী আফিসাদি ব্যতীত বসতবাটী, দোকান পাট প্রভৃতি সবই কেবল কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ইহার দুইটি কারণ, প্রথমত, এদেশে কাষ্ঠ খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে ও কাষ্ঠদ্বারা বাটী নির্ম্মাণে অল্প খরচ। আর একটা সুবিধা এদেশে উই পোকা নাই, আমাদের দেশ হলে কয়েক দিনের মধ্যে বাটী-গুলো ধরাসাৎ হত। ইঁদুর যথেষ্ঠ আছে, তবে তারা কাঠও কাটেনা, বস্ত্রও কাটে না; কেবল রাত্রিকালে ঘরের ছাদের উপর ও দোতালার মেঝে ও একতালার ছাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দলবেঁধে ছুটাছুটী করে ঘুমের খুব ব্যাঘাত করে। দ্বিতীয়ত, এখানে ভূকম্পন এতই নিরন্তর যে ইষ্টক বা প্রস্তরে নির্ম্মিত বৃহদায়তন বাটী নিরাপদ নয়। আর ক্ষুদ্রকায় জাপানীদের পক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটীই উপযুক্ত ব'লে বোধ হয়। বড় বাটীতে থাক্‌তে হলে তারা হাঁপিয়ে ওঠে।

তোকিও সহরে বৎসরে গড়ে ৯৬ বার ভূকম্পন হয় ইহা স্থিরীকৃত হয়েচে। কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটীগুলি ভূকম্পন থেকে রক্ষা পেলেও অগ্নি হ'তে রক্ষা পায় না। অগ্নি প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন অংশে দশ, বিশ কোন সময়ে বা শতাধিক গৃহ ভস্মসাৎ করে।

আজ কাল নবোদ্ভাবিত প্রথায় ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মিত হচ্চে, তা ভূকম্পনের আঘাত সহ্য কর্‌তে পারে।

এত বড় সহর, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপণের কোন সুব্যবস্থা নাই। অগ্নি এঞ্জিন গুলি সেকেলে ধরণের। যে ঘোড়াগুলি এঞ্জিন টেনে নিয়ে যায়, সে গুলি আকৃতিতে ও বেগে অনেকটা রজকের ভারবাহী বুদ্ধিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ জন্তুর মত। তাই "তোড়জোড়" করিতে গ্রাম পুড়িয়া ছারখার।

কোথাও আগুন লাগলে পাড়ার লোকের মহাস্ফূর্ত্তি। আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে সকলেই মজা দেখতে ব্যস্ত। অগ্নি নির্ব্বাপণে সহায়তা করা দূরে থাকুক বরঞ্চ জমাট বাঁধিয়া দাঁড়ানতে তাহাতে বাধা প্রদান করা হয়। রাত্রে কোথাও আগুন লাগ্‌লে বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়। পাড়ার লোক সকলে বংশযষ্টির সামনে কাগজের লণ্ঠন বেঁধে অভিনব লণ্ঠন-যাত্রার সৃষ্টি করে।

অনুষ্ঠানের কিন্তু ত্রুটি নেই। প্রতিবৎসর হিবিয়া পার্কে অগ্নি-এঞ্জিন গুলির একটি প্রদর্শণী হয়। একটা উচ্চ মঞ্চ তৈয়ারি করে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এবং এঞ্জিন দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাপণ করা হয়। কয়েক শত লোক উচ্চ মইয়ের উপর উঠে নানারূপ কস্‌রৎ দেখাইয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। কস্‌রৎ দেখাতে মজবুত হলেও অগ্নি নির্ব্বাপণে প্রায়ই ইহার বিপরীত!

প্রত্যহ রাত্রি কিছু অধিক হলে একটা লোক রাস্তা দিয়ে দুখানা কাঠ বাজিয়ে চলে যায়। এটি বহু পুরাতন প্রথা, গৃহস্থকে অগ্নি সাবধানে রাখিতে বলা ইহার একটি উদ্দেশ্য। সজাগ থাকিতে বলাও উদ্দেশ্য।

সহরে আমোদ প্রমোদের স্থানের মধ্যে প্রথমেই থিয়েটারগুলি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটিতে পুরাতন জাপানী নাটক অভিনীত হয় ও

কয়েকটিতে আধুনিক নাটক অভিনীত হয়ে থাকে। দিবা তুই তিনটায় আরম্ভ হয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলে। জাপানী থিয়েটারের বিশেষত্ব অরকেষ্ট্রা বা ঐক্যতান বাদন নাই ও নাটকের মধ্যে নৃত্যগীত আদৌ নাই। অভিনেত্রী খুব কম, অনেকস্থলেই স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষে অভিনয় করাতে বড়ই অস্বাভাবিক ও হাস্যকর হয়ে ওঠে। নাটকের পুরুষেরা সকল সময়ে পুরুষোচিত উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করে আর স্ত্রীলোকেরা কাঁদুনে সুরে কথাবার্ত্তা চালায়। তাহাদের এতদবস্থা দর্শনে বড়ই করুণার উদ্রেক হয়।

জাপানী অভিনেতা দেখে আমাদের দেশের যাত্রার ভীমসেনের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি যে সুরে প্রণয়িণীকে 'প্রিয়ে' ব'লে সম্বোধন করেন, তা প্রেমনিকুঞ্জকে সমর প্রাঙ্গণে পরিণত করে!

জাপানী দর্শকেরা পুরুষ ও রমণী উভয়েই রঙ্গালয়ে যেন "সংসার" পাতিয়া বসে। স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই আহারাদি চলিতেছে, ও দুগ্ধশর্করা বিরহিত সর্ব্বব্যাপী "ওচা" পান ও তৎপরে সেই অপরিহার্য্য হিস্ হিস্ শব্দ! চেয়ার ব্যবহৃত হয় না, এখানেও "ফুতন্" বা চতুষ্কোণ তুলার আসন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই "ফুতন্" গুলির জন্য আলাদা ভাড়া লাগে। প্রবেশ করিবার সময় জুতা বা কাষ্ঠ-পাদুকা রঙ্গালয়স্থ ভৃত্যের জিম্মায় রেখে যেতে হয় এবং তার জন্যও ভাড়া লাগে। হাত গরম করবার জন্য "হিবাচি"ও ভাড়া করতে হয়! টিকেট খানা কিনে কেবল এক টুকরা কাঠের উপর বস্‌বার অধিকার পাবেন, আর কিছু না!

যবনিকা গুটাইয়া উপরে উঠে যায় না একটা লোক একধার থেকে

অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায় ও যবনিকা খোলবার পূর্ব্বে ঘণ্টার পরিবর্ত্তে দুই খানা কাষ্ঠখণ্ডে আঘাত করে শব্দ করা হয়। নাটকের ন্যায় কোমল-কলায় এরূপ কর্কশ শব্দ একান্ত অনুপযুক্ত।

"কোতো।"

তা ছাড়া বহুসংখ্যক "টি হাউস্" আছে, সেখানে ধনী যুবকেরা পানাহার ও নর্ত্তকীদের নৃত্যগীতে তৃপ্তি অনুভব করেন। এই রূপ

বাটীগুলি জাপানী হোটেলের ধরণে তৈয়ারী। ঘরগুলি প্রশস্ত, মেঝেতে অতিশুভ্র মাতুর বিছান। এখানে জাপানী যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি, মদ্য ও সর্ব্বপ্রকার পানীয় বিক্রয় হয়। স্নানেরও বন্দোবস্ত আছে। "গেইষা"রা "সামিসেন্" বা "কোতো" বাজাইয়া নৃত্যগীতাদিতে অভ্যাগতের মনোরঞ্জন করে, আহারাদি পরিবেষণ করে ও হাস্য পরিহাসে আসর জমাইয়া তুলে। অনেক সময়ে-"টি-হাউসে" জাপানী সভা ও ভোজ হয়ে থাকে।

"য়োষিওয়ারা।"

১৯০৬ সালের গণনায় স্থিরীকৃত হয়—তোকিও সহরে ৩,৫২৬ জন "গেইষা"র বাস। তোকিও ম্যুনিসিপ্যালিটি এদের কাছ থেকে ১৬০,০০০ ইয়েন্* ট্যাক্স্ আদায় করে।

* ১ ইয়েন (কাগজ) = প্রায় এক টাকা নয় আনা।

নর্ত্তকী ছাড়া এ সহরে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বন করে আছে। উহাদের সংখ্যা ৬,৩৭৯। প্রত্যেক পল্লীতেই এদের বাস। তবে সহরের বাহিরে "য়োষিওয়ারা" নামে যে পল্লী সেখানেই এদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ স্থানটি একটি ছোট খাট সহরের মত। দোকান পসার, হাঁসপাতাল, প্রভৃতি সবই আছে। এখানে

য়োষিওয়ারাবাসিনী।

মাঝে মাঝে মেলা বসে, তখন অনেক লোক সমাগম হয়। এমন অনেক জাপানী ভদ্রলোক আছেন যাঁরা স্ত্রী পুত্র সমভিব্যহারে মেলা দেখ্তে যেতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাস্তার দু'ধারে প্রশস্ত ঘরে হতভাগিনী-দিগকে প্রচুর সাদা রঙ ও রঙিন কাপড়ে সজ্জিত করে বসাইয়া রাখা হয়। ঘরগুলি লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। রাস্তা থেকে ইহাদিগকে খাঁচার

মধ্যে অনেকটা হিংস্র জন্তুর মত দেখায়। রমণীতে যা কিছু মহৎ ও বরণীয় তা'বিসর্জ্জন দিয়ে এরা পশুতুল্য হয়ে উঠেচে।

পূরাকাল থেকে এরা ক্রীতদাসীরূপে বিবেচিত হয়ে আস্‌চে। ৫,৬ বৎসর বয়সে ক্রয় করে ইহাদিগকে এই ব্যবসা শিখান হত। জাপানে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় প্রথা বিদ্যমান না থাকলেও পুলীশ এ বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেনি, কারণ, এখানে বদ্‌মায়েস্ লোকের আনাগোনা হত বলে পুলীশের চোর ডাকাত প্রভৃতি ধরবার বেশ সুবিধা হত। ১৮৭২ সালে এই ব্যবসায় আরম্ভ করবার সময় স্ত্রীলোকের বয়স ষোল বৎসর হওয়া দরকার এই মর্ম্মে এক আইন জারি হয়। পরে ঐ বয়স বাড়িয়ে আঠার করা হয়েচে। ঐ আইনে ইহাও বলা হয়, যে স্ত্রীলোকের অন্য কোন উপজীবিকা নাই কেবল সেই এই ব্যবসা করিতে পাইবে ও পিতা মাতা বা অভিভাবকের লিখিত অনুমতি পত্র চাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ছোট ছোট মেয়েকে এই ব্যবসা শিখাইবার জন্য নেওয়া হয়। ব্যবসা আরম্ভ করিবার মত বয়স হইলে স্ত্রীলোক তার কর্ত্তার নিকট হতে প্রায় ১০০০ ইয়েন্ তাহার পোষাক পরিচ্ছদ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য কর্জ্জ করে, এবং এই টাকা পরিশোধ দিতে সে বৃদ্ধা হয়ে যায়। তাই এখনও পূর্ব্বের মত সে ক্রীতদাসী!

জনসাধারণের কয়েকটি বিশেষ আদরের নাটক হতে ইহা অনুমিত হয় যে অনেক সাধারণ, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন জাপানীর মতে কুলটা-বৃত্তিতে দোষের কিছুই নাই, বরং তাহা মাননীয়!

সহরের লোকের বায়ু সেবন ও আমোদ প্রমোদের জন্য যে উদ্যানগুলি আছে তন্মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। "আশাকুশা" স্ফূর্ত্তির

জায়গা। "উয়েনো" ইহার বিপরীত। ইহা জ্ঞানের দিকে, জীবনের গম্ভীর ভাবের দিকে, হেলিয়াছে। "হিবিয়া" য়ুরোপীয়, বিংশ শতাব্দীর প্রমোদোদ্যানের আদর্শে গঠিত, ও "ষিবা" শান্তিময়—প্রাচীন ভারতের তপোবনের ছায়ার মত।

"ষিবা" উদ্যানে ঢুকবার মুখে "জোযোযি" মন্দিরের সম্মুখে গাড়ী (ট্রাম) থামে। লাল রঙের মন্দির, প্রকাণ্ড ফটক পার হলেই প্রশস্ত
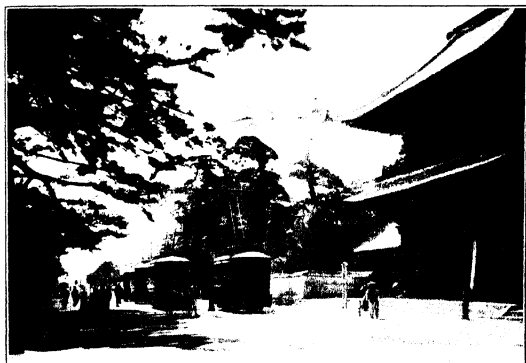
জোযোযি মন্দির।

প্রাঙ্গণ। তার পর মন্দির আরম্ভ হয়েচে। মন্দিরের উভয় পার্শ্বে বিখ্যাত "ষোগুন্"দেরসমাধি। এ ঘরগুলি স্বর্ণ ও "ল্যাকার" নির্ম্মিত সামগ্রীতে পূর্ণ। প্রস্তর ও কাষ্ঠের উপর সুন্দর কারুকার্য্য করা। প্রস্তর ও পিতল নির্ম্মিত সুবৃহৎ লণ্ঠনও আছে। নিকটেই "বেন্তেন",

(ইহাঁকে দেবী বলাই ঠিক কারণ ইনি রমণী) পুষ্করিণী, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ ও মন্দির। ইনি অদৃষ্টের সপ্ত দেবদেবীর একজন। তাই প্রাণময়ী "দেবী"রা ইহাঁর নিকট তাঁহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করতে আসেন। জাপানে রমণীর অদৃষ্ট মন্দ, দেবী-সন্নিধানে কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেন, কে জানে দেবী তার কতগুলি পূরণ করেন!

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়। নিকটেই তার ব্যবস্থা আছে। প্রথমেই বিদেশী ধরণের ভোজনালয়, এখানে সব রকম বিদেশী খাদ্যই পাবেন। যদি বিদেশী ঘ্যাঁসা না হন তা হলে হয়ত বল্‌বেন, ভারতবাসী হয়ে, জাপানে এসে বিদেশী খাদ্য খেতে যাব কেন? বেশ, পরের বাড়ীতে যান। ওটি হচ্চে বিখ্যাত "কোয়োকান", ইংরাজি নাম "মেপল্ ক্লব্।" সম্পূর্ণ জাপানী ধরণে সজ্জিত। জাপানী খাদ্য সবই পাওয়া যায়। সুন্দরী নর্ত্তকী নিযুক্তা আছে, ইচ্ছা করিলে নৃত্য দেখিয়ে আপনার চিত্ত বিনোদন করবে। কিন্তু প্রস্তুত হয়ে যাবেন জুতা খুলে ঢুকতে হবে, চেয়ার নাই সে জন্য মেঝের উপর পা মুড়িয়া বসিবার ব্যবস্থা। সুন্দরী পরিচারিকা অন্ন পরিবেষণ করবে। এখানে মধ্যে মধ্যে জাপানী সম্ভ্রান্তলোকেদের পানভোজনাদির সভা হয়ে থাকে। বিদেশী সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতকেও জাপানীধরণে অভ্যর্থনা করা হয়। মার্কিনের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট্ ট্যাফ্ট্‌কে এখানে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল।

এই "তপোবনে" কেবল যে "অসভ্য হিদেনের" মন্দির আছে তা নয়, মন্দিরের অনতিদূরে "সুসভ্য ক্রিষ্টিয়ানের" একটি গির্জ্জাঘর আছে। সহরের অধিকাংশ য়ুরোপীয়ান রবিবার এই গির্জ্জায় উপাসনা করেন।

"সেণ্ট্ এণ্ড্রু চার্চ্চে" কয়েকজন ইংরাজ ও আইরিষ পাদ্রি থাকেন। এঁরা বেশ মিশুক। আমাদের অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে এঁদের সঙ্গে অনেক সুখের সন্ধ্যা কাটিয়েচেন। তাঁরা বাইবেলের তর্ক তুলে কখন আহারে বাধা দেন না, সে জন্য তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

আসাকুসা স্ফূর্ত্তির স্থান হলেও উদ্যানের প্রবেশপথেই একটি মন্দির। ঐ মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ "খানন্ সামা", করুণার দেবী। যেন সহস্র হস্ত বিস্তার করে ইনি সর্ব্বদা দুঃখিজনের দুঃখ বিমোচনে প্রস্তুত। কথিত আছে ৭০৮ খৃষ্টাব্দে এক ধীবরের জালে সুমিদা নদী হইতে এই মূর্ত্তি উঠে। দেবীর নিকট দুঃখ নিবেদন করবার জন্য প্রত্যহ অনেক দরিদ্র লোক আসে। আসে পাশে অনেক দরিদ্রের বাস, আর দুঃখের বোঝা দরিদ্রেই বেশী বহন করে।

এই মন্দিরের "বিন্জুরু সামা"র গুণ অনেক। কারও শরীরের কোন অংশে বেদনা হলে বিগ্রহের শরীরের সেই অংশে হাত বুলাইয়া নিজের শরীরের বেদনাযুক্ত অংশে হাত বুলাইলে নাকি বেদনা সারে। সত্য হলে মন্দ নয়, ডাক্তার খরচ বেঁচে যায়! মন্দিরের ছাদের নীচে অনেক কপোত বাস করে। এরা সাধারণদত্ত অন্ন খেয়ে বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্চে।

মন্দির অতিক্রম করে উদ্যানে পড়্লেন। অল্প পয়সা খরচ করে সারাদিন বেশ আনন্দে কাটাতে পারেন। এখানে সবই আছে। কোথাও বা পশুপ্রদর্শনী, দুচারটে জানোয়ার আছে। কোথাও জাপানী মেয়ে পুরুষে কসরৎ দেখাচ্চে, কোথাও বায়স্কোপ বা "চঞ্চল চিত্র" প্রদর্শিত

হচ্চে। এই খানেই বেশী লোক হয়, একবার টিকিট কিনে যতক্ষণ ইচ্ছা দেখা যায়। জাপানে "চঞ্চল" চিত্রের খুব আদর, সহরের অনেক স্থানে খুব শস্তা দামে দেখান হয়। এইরূপে ঘরে বসে জগতের অনেক জিনিষ দেখা যায়। জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে এ প্রথা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

উদ্যানে ভ্রমণ করবার সময় সাবধান হবেন নচেৎ আপনার পকেট থেকে মনিব্যাগটি কখন অন্তর্হিত হবে টেরও পাবেন না! এ অঞ্চলে গাঁটকাটার বড়ই প্রাদুর্ভাব। কয়েক বৎসর আগে গাঁটকাটাদের সর্দ্দার এই পল্লীতে থাকতেন। দুর্ভাগ্যবশত বা সৌভাগ্যবশত তিনি এখন "স্বর্গে"। তার মৃত্যু হলে শবের পশ্চাতে নাকি এত লোক অনুগমন করেছিল যে অনেক রাজারাজড়ার মৃত্যুতেও এত লোক যায় না! এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় সহরে গাঁটকাটার সংখ্যা কত।

এখানে একটি বার তালা "টাওয়ার" আছে, ইহাই তোকিওর "মনুমেণ্ট্"। এর উপর উঠে সহরের সমস্তটা দেখা যায়।

হিবিয়া য়ুরোপীয় ধরণের উদ্যান। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যায় মধ্যে মধ্যে ব্যাণ্ড্ বাজে। ব্যাণ্ডের মঞ্চের সম্মুখেই অনেকটা খোলা জায়গা। এখানে ইস্কুলের ছেলেরা খেলা করে। ঘুড়ি উড়োয়, "বেস বল" খেলে, সম্প্রতি আবার "হকি" ও "ফুট্‌বল" ও আরম্ভ করেচে। জমিটি আমাদের দেশের মত তৃণাচ্ছাদিত নয়, সাদা কাঁকরে ভরা। জমির একধারে একটি ভোজনালয় আছে, গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় অনেকে এখানে "আইস্ ক্রিম" খেতে আসেন। ভোজনালয়ের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তার মাঝে একটা মঞ্চের উপর এক ধাতুনির্ম্মিত বক উর্দ্ধমুখে অবিরাম জল উদ্গীরণ কচ্চে।

হিবিয়া পার্ক্।

বেচারা বকটিকে দেখে বড় কষ্ট হয়, তার ঘাড় নামাইবার উপায় নেই, মুখও বন্ধ কর্‌তে পারে না। যারা বেশী কথা কয় তাদের এরূপ শাস্তি দেওয়া বিধেয়।

রুশ্‌-জাপান যুদ্ধের শেষে অ্যাড্‌মিরাল তোগো ও মার্ষ্যাল ওয়ামা তোকিও প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লে এই উদ্যানের মধ্যে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। আবার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর এই স্থান হতেই হাঙ্গামা আরম্ভ হয়ে সহরে অরাজকতার সৃষ্টি করে।

হিবিয়া সহরের মধ্যভাগে অবস্থিত ও যে কোন অংশ হইতেই অতি সহজে আসা যায়।

উয়েনো উদ্যানের সহিত বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে। তৃতীয়

তোকুগাওয়া যোগুন ইয়েমিৎসু এ স্থানটির সহিত বিশেষরূপে জড়িত ছিলেন। ইনি কঠোর হস্তে খৃষ্টধর্ম্ম দমন করেছিলেন ও স্বদেশের উপর জায়গির-প্রথা-উদ্ভূত ঘোর অত্যাচার মূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানে তিনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দিরটি নাকি জাপানের অন্যান্য সকল মন্দির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। সেই হেতু কিয়োতো-বাসী মিকাদোর পুত্র এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অন্তর্যুদ্ধের শেষ একটি যুদ্ধ এখানে হয়েছিল। যোগুনের সৈন্যদল বিশেষরূপে পরাজিত হয়ে মঠাধ্যক্ষের সহিত পলায়ন করে ও পরে উহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। যুদ্ধের সময় আগুন লাগিয়া সুন্দর মন্দিরটি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

উদ্যানের এক অংশে যোগুনদের কবর আছে। যে জায়গাটির উপর বিখ্যাত মন্দিরটি ছিল, আজ কাল সেখানে মিউসিয়াম্। অনতি-দূরেই সঙ্গীত-বিদ্যালয়. এখানে যাবতীয় আধুনিক সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজকীয় পুস্তকাগার ও চিত্রাঙ্কনের ইস্কুলও নিকটে। এই তিনটিই সহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুস্তকাগারে নানা ভাষায় অনেক পুস্তক আছে। বৎসরে কয়েক দিন ব্যতীত প্রত্যহ এস্থান খোলা থাকে। পাঁচ পয়সার টিকিট কিনে সমস্ত দিন পড়া যায়। পড়িবার ঘরগুলি প্রশস্ত, আলোক ও বায়ু প্রবেশের বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। পুস্তকাগারে পুস্তক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ, ও প্রতি দিন গড়ে পাঠক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি শত। সহরের শ্রেষ্ঠ পশুশালাও এই খানে। পশুশালাটি, জাপানের অন্যান্য অনেক জিনিষেরই মত ক্ষুদ্র, নগণ্য। একটি হস্তী দেখেছিলুম, সেটি যে বিশেষ বৃহৎ তা নয় কিন্তু এদেশের

লোকের হস্তীকে বড় ভয়। বেচারা হাতীটির বড়ই দুরবস্থা। তার চরণে "কঠিন নিগড়," চলাফেরা করবার উপায় নেই। দর্শকেরা সভয়ে দূর থেকে দেখে চলে যায়।

উদ্যানের মধ্যে একটি সুন্দর য়ুরোপীয় ধরণের হোটেল ও ভোজনালয় আছে। হোটেলের সম্মুখে সারি সারি "সাকুরা" গাছ। বসন্তে ফুল ফুটলে অনেক লোকের সমাগম হয়।

এখানে, যেমন ষিবা উদ্যানে, মনুষ্যহস্ত স্বভাবকে খর্ব্ব করে নি। রাত্রিকালে স্থানটি বড় নির্জ্জন। বড় বড় গাছের ছায়া জমাট অন্ধকারের সৃষ্টি করে স্থানটিকে ভৌত আকার প্রদান করে।

১৯০৭ সালে এই খানে একটি বৃহৎ প্রদর্শনী বসেছিল। জাপান-জাত যাবতীয় দ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছিল। নানা রকম আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। উদ্যানের বাহিরে আসিলেই একটি বাজার। বাটীর মধ্যে ঘোরান পথ দিয়া ঘুরিতে হয়। সহরে স্থানে স্থানে ঐরূপ অনেক "কাঙকোবা" আছে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়।

উয়েনোর অনতিদূরেই রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই পল্লীটির নাম হোঙগো। নিকটেই দাঙ্গোজাকা "ক্রিসন্থিমম্" ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ।

কোইষিকাওয়া নামক পল্লীতে দুটি সুন্দর উদ্যান আছে। একটি গভর্ণমেণ্টের আয়ুধাগারের মধ্যে, অপরটি বট্যানিক্যাল গার্ডেন। রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় এই পল্লীতে অবস্থিত।

সহরে অনেকগুলি ষিন্তো ও বৌদ্ধ মন্দির আছে, তন্মধ্যে "যোকোন্‌ষা" বা স্বদেশের জন্য মৃত বীরাত্মাদের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রেষ্টোরেসনের যুদ্ধের পর, ১৮৬৯-১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে

ষোকোন্ষা।
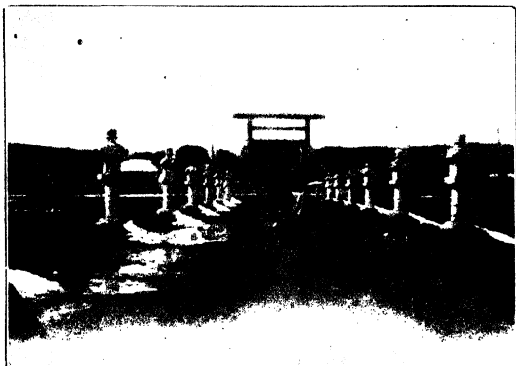
যে সকল যোদ্ধা সম্রাট ও দেশের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করেছিলেন, তাঁদের আত্মার উদ্দেশে জাপানের বিভিন্ন সামরিক কেন্দ্রে ঐরূপ অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হয়। মে মাসে ও নভেম্বর মাসে, বৎসরে দুইবার এই সব লোকান্তরিত আত্মাদের পূজার জন্য উৎসব হয়। এদেশের লোকের বিশ্বাস যাঁরা দেশের জন্য মরেন তাঁরা মৃত্যুর পর দেবত্ব প্রাপ্ত হন, ও তাঁদের আত্মা সর্ব্বদা দেশকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন, ও যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে স্বদেশের সৈন্যগণকে উৎসাহিত করেন। তিন দিন উৎসব হয়: প্রথম দিন প্রাতে সম্রাট-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা বা তাঁহাদের প্রতিনিধিরা পূজা করেন। দ্বিতীয় দিন প্রাতে নৌ বিভাগীয় লোকেরা ও সৈন্যেরা পূজা করেন, ও শেষ

দিন জনসাধারণ, ও মৃত যোদ্ধাদের সন্তানসন্ততিরা পূজা করেন। কয়দিনই মন্দির প্রাঙ্গণে তরবারি ক্রীড়া, উল্লম্ফন, ধাবন, য়ুযুৎসু, কুস্তি প্রভৃতি বীরোচিত ব্যায়াম প্রদর্শিত হয়। দূর প্রদেশ হতে পালোয়ানেরা আসিয়া উৎসবে যোগদান করে।

মন্দিরটি উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। নিকটেই অস্ত্রপ্রদর্শনী। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় লিখিত হয়েচে। নীচে নামিয়া এলেই অনেক পুরাতন পুস্তকের দোকান। অনেক সময় এখানে মূল্যবান ভাল ইংরাজি পুস্তক আধাদরে বা তদপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায়। অনেক পুস্তক একেবারে নূতন বলিতে পারা যায়। জাপানী ছাত্র হয়ত কোন ইংরাজ বা আমেরিক্যানের সহিত আলাপ করলেন, উদ্দেশ্য ইংরাজি শেখা। দু চারখানা ভাল ভাল ইংরাজি পুস্তকের নাম জেনে অগ্র-পশ্চাত কিছু না ভেবেই কিনে ফেললেন। বই কিনে তার দু পাতা উল্টে দেখেন কিছু বোধগম্য হয় না, আর হবেই বা কেমন করে? পড়েচেন বোধ হয় "ইশপস্ ফেবল্‌স্" তারপরে একেবারে পড়্‌তে গেছেন "মেকলে"। যাহা হউক যে পুস্তক কয়খানি কিনেছিলেন সেগুলি পুরাতন পুস্তকের দোকানে বিক্রয় করে দিলেন, আর আমরা, যাদের পয়সা কম অথচ জ্ঞানলাভেচ্ছা প্রবল, সেগুলি অল্প দরে ক্রয় করলুম।

আমাদের দেশে ঘুম ভাঙে পাখীর ডাকে, বিশেষত কাকের ডাকে। এখানে কাকের সংখ্যা খুব অল্প এবং তাদের ডাক প্রায় শুনা যায় না। খুব শীতের সময় দাঁড়কাকগুলো একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করে। বোধ হয় শৈত্যের প্রাবল্যে তাদের স্বর বিকৃত হয়ে যায়।

ভোরের বেলায় জাপানী বাটীর বারান্দা বা জানালার তক্তা

ঠেলিবার হড়্‌হড়ানিতে ঘুম ভেঙে যায়। দিনেরবেলায় জানালা ও বারান্দা খোলা থাকে, সন্ধ্যাগমে পার্শ্ববর্ত্তী খোপ হতে "আমাদো"গুলি বাহির করে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। বারান্দার প্রান্তে খাঁজকাটা আছে এবং ঘরের ছাদের নিচেকার কড়িতেও খাঁজ আছে, তক্তাগুলি ইহার মাঝে বেশ দাঁড়িয়ে থাকে ও এক প্রান্ত হতে অপর দিক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই ফিরিওয়ালা হেঁকে যায় "নাত্তো, না—ত্তো।" এটি দরিদ্রের খাদ্য, একপ্রকার সিম। তার পরেই ঠুন্ ঠুন্ শব্দ পাবেন। খবরের কাগজওয়ালা কোমরে ঘণ্টা বেঁধে ছুটোছুটি করে কাগজ বিলি করচে। আর দু একটা ফিরিওয়ালার হাঁক শুনতে পাবেন। "তোফু" ওয়ালা সকালে বিকালে দু-বেলাই ভেঁপু বাজিয়ে ফিরি করে। এ জিনিষটিও সিম থেকে তৈয়ারি, অনেকটা ছানার মত। জাপানীরা এ দিয়ে সূপ তৈয়ারি করেন। ধূমপানের নল পরিষ্কার করবার জন্য ফিরিওয়ালা ছোট একখানা গাড়ী হাতে টেনে বেড়ায়। এ ফিরিওয়ালা কিছু হাঁকে না। গাড়ীর উপরে একটা ছোট নল উঠেচে, সেটার ভিতর থেকে বাষ্প বেরিয়ে অবিরাম পীঁ পীঁ শব্দ করচে। বাষ্প দ্বারা যখন নল পরিষ্কার করে কেবল তখন শব্দ থামে।

বাটীর সামনে যে সব তেলের আলো আছে মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে একবার তেল ভর্ত্তি করে দিয়ে যায় ও সন্ধ্যার সময় এসে জ্বালিয়ে দেয়। এজন্য গৃহস্থকে মাসিক কিছু কিছু দিতে হয়। সন্ধ্যার সময় আবার খবরের কাগজ বিলি করে। বিশেষ সংবাদ কিছু থাকলে কাগজওয়ালারা চীৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটে যায়।

অনেক সময় কেবল ফাঁকি, সামান্য একটা খবর বার করে অনেক পয়সা রোজকার করে। প্রত্যহ হাজার হাজার কাগজ বিক্রি হয়। ট্রামের জংসনে নগদ বিক্রি হয় অনেকে কর্ম্মস্থানে যাইবার পথে কাগজ কিনে পড়েন। দাম খুব সস্তা, দুই পয়সার বেশী নয়; অনেক কাগজ এক পয়সা।

রাত্রে যখন অনেকে বিছানার আশ্রয় নিয়েচেন, কেহবা ঘুমোবার উদ্যোগ করচেন তখন একটি করুণ বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাবেন। যে লোকটি বাঁশি বাজিয়ে যাচ্চে সাধারণত সে অন্ধ, লোকের গা হাত পা টিপে পয়সা উপার্জ্জন করে। অনেক স্ত্রীলোকও এই কাজ করেন।

তিনটি বড় বাজার সহরের লোকের আহারীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। তন্মধ্যে নিহোমবাষির মৎস্যের বাজারটি বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। এ অঞ্চল দিয়ে হাঁটিয়া গেলে "শুঁটকি" মাছের দুর্গন্ধে অস্থির হতে হয়। বাজারের পাশ দিয়ে খাল, সমুদ্র থেকে নৌকাযোগে খালের ভিতর দিয়ে মাছ আসে। প্রাতঃকালে বাঁক বা টানাগাড়ী লইয়া মাছওয়ালারা উপস্থিত থাকে, এখান থেকে মাছ কিনে গৃহস্থের বাটীতে গিয়া বিক্রয় করে।

অ্যাপল্, পীচ, ষ্ট্রবেরি, নাশপাতি প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে কলা, আম, আনারস, পেঁপে প্রভৃতি গ্রীষ্মদেশসুলভ ফল এখানে দুষ্প্রাপ্য।

সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে কোন মন্দিরের পাশে মেলা বসে। বৈকালবেলা থেকে দোকানদারেরা টানা গাড়ীতে তাদের পুরাতন ও শস্তা মাল লইয়া আসিতে আরম্ভ করে, ও সন্ধ্যা নাগাদ "এন্নিচি" বা

"মাৎসুরী" দোকানদারে ও খরিদ্দারে পূর্ণ হয়ে যায়। অনেকে কেবল সময় কাটাবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেদের খেলনা, ঘরকন্নার জিনিষ প্রভৃতি বিক্রিত হয়। কোথাও এক জাপানী তার খেলো জিনিষের গুণকীর্ত্তনে গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেচে। জাপানীরা বাগ্মীর জাতি, প্রত্যেকেই যেন একটি ছোটখাট "সুরেন বাঁড়ুযো"! একবার দাঁড়ালে খুব খানিকটে গড়্ গড়্ করে বলে যেতে পারে। মেলায় অনেক রকম ফুলের গাছ ও চারা গাছ বিক্রিত হয়।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় মেলা ভাঙে। দোকানদারেরা তাদের অবশিষ্ট জিনিষপত্র আবার গাড়ীতে তুলে ফিরে যায়। মেলা ভাঙবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হয়, জিনিসের মূল্যও সেই হারে কমিতে থাকে। দোকানদার একবার যে জিনিষ বিক্রয় করবার জন্য বয়ে এনেচে স্বভাবতই সেগুলি ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা হয় না।

সহরের মধ্যে অনেক খাল। তার উপরদিয়ে নৌকা করে জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। খালের জল ভারি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ তাই কোন কাজে লাগে না। চারিটি রেল ষ্টেসন আছে সেগুলি সব ছোট ছোট। আজকাল সহরের মধ্য দিয়ে উন্নত (elevated) রেল নির্ম্মিত হচ্চে, তার উপর দিয়ে রেলগাড়ী ও ইলেক্‌ট্রিক-কার যাতায়াত করবে।

তোকিও হতে রেলে দু'ঘণ্টার রাস্তা, সমুদ্রতীরে অবস্থিত "কামা-কুরা" বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। শীতকালে তোকিও অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত গরম, ও গ্রীষ্মে অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে কখনই সন্দর্শকের অভাব হয় না। গ্রীষ্মে অনেকেই সমুদ্রে স্নান করেন, পুরুষ ও রমণী সকলেই জলে সাঁতার দিতে ভালবাসেন।

স্থানটি ক্ষুদ্র, নিস্তব্ধ। ঠিক সমুদ্রের উপর একটি সুন্দর য়ুরোপীয় ধরণের হোটেল আছে। এখানে তোকিও ও য়োকোহামা হতে সপ্তাহ শেষে অনেক য়ুরোপীয়ান আসিয়া দু এক দিন কাটিয়ে যান।

হোটেলের পশ্চাদ্ভাগে বালুকাময় তটভূমিতে গিয়া বসিলে জেলেদের মাছ ধরতে দেখবেন। সমুদ্রের শুষ্ক মিঠে বাতাস ও উজ্জ্বল রৌদ্রের মধ্যে জেলেদের গান বেশ একটু মনে আনন্দ এনে দেয়।

তোকিওর সহিত তুলনায় স্থানটি নগণ্য হলেও চিরদিন এমন ছিল না। এমন কি যখন তোকিওর নাম কেহই জান্‌তনা তখন এস্থান সমৃদ্ধ নগর ছিল, ও আজিকার নিস্তব্ধতার পরিবর্ত্তে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা স্থানটিকে মুখরিত করে রাখ্‌ত। যোগুন ও সম্রাট তখন কিয়োতোয় বাস কর্‌তেন ও প্রকৃত শক্তি কামাকুরাবাসী হোজো বংশীয় সামরিক কর্ম্মচারীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। স্থানটি "সামুরাই" ও যোদ্ধায় পরিপূর্ণ ছিল। হোজোবংশীয়েরা তরবারী দ্বারাই শাসন কর্‌তেন।

কিছুকাল পরে এই স্থান বিলাসিতার স্রোতে ভাসিল, সেই দিন হতে কামাকুরার অধঃপতনের আরম্ভ।

অনেকেই প্রতিবাদ কর্‌লেন। চতুর্দ্দিক হতে অভিযোগ শ্রুত হতে লাগ্‌ল। মোঙ্গোলেরা দেশ আক্রমণ কর্‌বে শুনা গেল। বৌদ্ধ সংস্কারক ভাবীবাদী নিচিরেণ প্রতিনিধির শাসন প্রণালীর মূর্খতা জন সমক্ষে প্রচারিত কর্‌তে লাগলেন। এই হেতু স্বভাবতই তিনি শাসন সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হয়ে উঠ্‌লেন। কয়েকবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান। একবার তাঁর শত্রুরা রাত্রে তাঁর বাটী আক্রমণ করে, কিন্তু উদ্যানের বানরেরা তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ

করে হাত ধরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। তারপর এক গুণ্ডা মাঝিকে তাঁকে কোন এক স্থানে নির্ব্বাসনে নিয়ে যেতে বলা হয়। রাত্রিকালে তাঁকে নৌকা থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি সন্তরণ করে তীরে উঠেন ও পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হন। এই বার তাঁর শিরশ্ছেদের হুকুম হ'ল। হাঁটু গাড়িয়া নিম্ন মুখে তিনি খড়্গের ঘা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বার

হাচিমান মন্দির।

বার তিন বার ঘাতক চেষ্টা করিল, তিন বারই এক বিদ্যুতপ্রভা ঘাতকের উত্থিত হস্ত রোধ করিল। অবশেষে প্রতিনিধি নিজ অভিসন্ধি পরিবর্ত্তনে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিচিরেণকে অব্যাহতি দিলেন।

এখানকার হাচিমানের মন্দির খুব বিখ্যাত। হাচিমান যুদ্ধের দেবতা,

স্থানের উপযুক্ত দেবতা বটে! এই মন্দিরটির মধ্যে তখনকার বীরদের পুরাতন বর্ম্ম, উরস্ত্রান, ধ্বজা, ধনুর্ব্বান প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত আছে। এগুলি বিগতবিভবের ধ্বংশাবশেষ।

এক দিন যে স্থান তরবারির ঝনঝনা, ধনুর টঙ্কার ও রণ অশ্বের পদশব্দে শব্দায়মান ছিল আজ সেখানে নিঝুম শান্তি বিরাজ করচে। সংগ্রামের জন্য যে স্থান প্রসিদ্ধ ছিল আজ সেখানে শান্তির বার্ত্তাবহ গৌতম বুদ্ধের বিরাট্ ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি দর্শকের মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগাইয়া দিতেছে।

এত বড় মূর্ত্তি কখন দেখি নি। উচ্চে ৪৯ ফিট ৭ইঞ্চ্, বেড় ৯৭ ফিট ২ইঞ্চ্, মুখের দৈর্ঘ্য ৮ ফিট ৫ ইঞ্চ্, এক কর্ণ হতে অন্য কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ১০ ফিট ৯ ইঞ্চ্, এক হাঁটু হতে অন্য হাঁটু পর্য্যন্ত, ৩৫ ফিট ৮ ইঞ্চ।

মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, গাত্রে উত্তরীয়, যোগাসনে উপবিষ্ট। প্রশস্ত বক্ষ, স্কন্ধদেশ উন্নত, বিরাট্ দেহ, কিন্তু প্রশান্ত নির্ব্বিকার বদন মণ্ডলে শিশুজনসুলভ শান্তি ও সরলতা। তাঁর আত্মার বিমল জ্যোতি মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সুদূর অতীতে রাজার ঘরে জন্মে, তিনি রাজৈশ্বর্য্য, স্ত্রী পুত্র, পিতামাতা সকল ত্যাগ করে, জগতের বিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করেছিলেন, আপনার জনকে ত্যাগ করে তিনি বিশ্বমানবকে আপনার করে নিয়েছিলেন, ক্ষুদ্র একটি পাখীর জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদিত! কত শত রাজা উঠেচে, পড়েচে; কত রাজ্য কিছু কালের জন্য জেগে উঠে আবার নিবে গেছে। কাল তাদের উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলে দিয়েচে, কিন্তু এই যে রাজ্য যা ধর্ম্মের উপর, পুণ্যের উপর, প্রেমোপরি প্রতিষ্ঠিত তা উত্তরোত্তর বিস্তার

কামাকুরার বৌদ্ধমূর্ত্তি।

লাভ করেচে, আর যে রাজপুত্র-ভিখারী এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর!"

১২৫২ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। মন্দির গৃহ দুইবার ১৩৩৫ ও ১৩৬৯ সালে ঝটিকাবেগে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। মন্দিরটি পুনর্নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ১৪৯৫ সালের ভীষণ বন্যা তাহা ভাসাইয়া লইয়া

যায়। সে অবধি মূর্ত্তিটি মুক্ত আকাশ তলে অবস্থিত। মূর্ত্তিটির অভ্যন্তর ফাঁপা, ভিতরে সিঁড়ি আছে তা দিয়ে মাথা পর্য্যন্ত উঠা যায়।

কামাকুরা হতে চার মাইল দূরে এনোষিমা। এটি একটি দ্বীপ, প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। দর্শনীয় পদার্থ একটি গহ্বর। বেন্তেন্, যিনি এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত। এখানকার বাসীন্দা খুব কম। কয়েকটি দোকানে ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতি নানাবিধ সামুদ্রিক দ্রব্য বিক্রয় হয়।

সমাজ।

সকল দেশেই স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সমাজ গঠিত। সমাজে সকলের অধিকার সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সামাজিক নিয়মাদি ভিন্ন। কোথাও বা সমাজের সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হয়; কোথাও বা স্ত্রী ও পুরুষের সামাজিক অধিকারের মধ্যে একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েচে; এবং সমস্ত সুযোগ তাহারই প্রাপ্য, এই স্বার্থপর চিন্তা পুরুষের চিত্তকে অহঙ্কারে আচ্ছন্ন করেচে। ফলে অনেক দেশেই, বিশেষতঃ যে সমাজের জাতীয় স্বাধীনতা নাই, বহুদিন অপহৃত হয়েচে,—স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বেশ পরিস্ফুট। কেবল জাতীয় স্বাধীনতার অভাবই এক সমাজের লোকদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে এমন নয়; অন্যান্য অনেক কারণ আছে। জাপান কোন দিন স্বাধীনতা হারায় নি, অর্থাৎ বিদেশীর দ্বারা শাসিত হয় নি; তবুও স্ত্রী ও পুরুষের আসন সমাজে সমান নয়। এখানেও পুরুষ আপনাকে প্রধান মনে করে, ও স্ত্রীলোকের সন্তান পালন করা ব্যতীত সমাজে অন্য কোন কাজ আছে এমন মনে করে না। এবং তাকে নতমস্তকে পুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করতে হবে, ইহাই বহু পূরাকাল থেকে বিধিবদ্ধ হয়ে আজ পর্য্যন্ত চলে আস্‌চে।

যে সমস্ত নিয়মের মধ্যে থাকিয়া জাতি বর্দ্ধিত হয়, তদনুসারে সমাজ-জীবন গঠিত হয়ে থাকে। আজকালকার জাপানকে বুঝ্‌তে হলে, প্রাচীন জাপানের সামাজিক নিয়মাদির একটু আলোচনা আবশ্যক।

জাপানীরা সমর-বিদ্যায় খুব পারদর্শী, তা যাঁরা চীন-জাপান, ও সম্প্রতি রুশো-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস অনুধাবন করে দেখেচেন, তাঁরা জানেন। বরাবরই এদেশীয়েরা যুদ্ধপ্রিয়। জাতিকে কষ্টসহিষ্ণু ও আদেশের বশ্য করবার জন্য অহরহ সামাজিক কঠোর নিয়মের অধীনে প্রত্যেককে থাকতে হত। এই সব নিয়মাবলী আমাদিগকে প্রাচীন স্পার্টার সমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কেমন করে পোষাক পরবে, কথা কইবে, বেড়াবে, আহার করবে, অভিবাদন করবে, জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করবে; সবই নিয়মাধীন ছিল। লোকের অবস্থা অনুসারে, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্য অনুসারে, বাটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিরূপিত হত। এমন কি বাটীর ছাদ খড়ের হবে, কি পাকা হবে, তাও গৃহস্থের অবস্থা ও ঐশ্বর্য্যের অধীন ছিল। বন্ধুবান্ধবকে উপহারাদি দিবার সময় সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে চলতে হত। হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হলে, ক্রোধ দমন করে মুখে ক্রোধের পরিবর্ত্তে আনন্দের ভাব প্রকাশ করতে শিক্ষা দেওয়া হত; যখন বুক ভেঙে কান্না বেরোবার উপক্রম হত তখন মুখে হাস্যের বিকাশ করতে হত! আজও জাপানী সে শিক্ষা ভুলতে পারে নি। আপনি উচ্চৈঃস্বরে খুব গালাগালি করচেন, জাপানীর মুখে কিন্তু মৃদুহাস্য, সে বারবার আপনাকে অভিবাদন করচে! গালাগালিগুলো তাকে আঘাত করচে না ভেবে আপনি যতই উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হবেন, জাপানী ততই মোলায়েম হবে। যখন খুব আস্তে চাপা গলায় কথা কবে, তখনই জানবেন জাপানী খুব রেগেচে।

মুখের হাসিটিও কঠোর শাসন প্রণালীর হাত থেকে রক্ষা পায় নি; কখন কি ভাবে হাসতে হবে ও কতটুকু হাসতে হবে তারও একটা বিশেষ

নিয়ম ছিল। কারও মৃত্যু হলে শবাধার মৃতের অবস্থা অনুসারে নিয়মানু যায়ী রূপে তৈয়ারি করতে হত।

তখনকার দিনে, "সামুরাই" বা ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্বদা সঙ্গে দুই খানা তীক্ষ্ণধার তরবারি নিয়ে ঘুরতেন, ও কেউ সামান্য শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ করলে তখনই তার শিরশ্ছেদ করতেন। তাঁদের নিজেদেরও আত্ম-সম্মান জ্ঞান অতি প্রখর ছিল, তাই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ছিল না; কখনও যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অপারক হতেন, তা হলে স্বহস্তে নিজ পেট চিরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেন। সামুরাই রমণীদিগকে যুদ্ধে নিহত স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে হত!

প্রাচীনকালে, দোষের শাস্তি অন্যান্য দেশের মত অতি কঠোর ছিল। সামান্য জরিমানা হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারত। প্রকাশ্যে কেহ ঝগড়া বিবাদ করলে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হত।

একই ভাষা পুরুষ একভাবে বলত, স্ত্রীলোক অন্যভাবে বলত। এখনও একই ভাষা পুরুষের মুখে ও স্ত্রীলোকের মুখে কত বিভিন্ন! পুরুষের কথায় যেন সংক্ষেপ করবার ইচ্ছা ও কাঠিণ্যের ভাব দেখতে পাই; রমণীর কথা অতি সামান্য হলেও, তাতে স্বভাব সুলভ কোমলতার অভাব নেই।

এখনও "তুমি" ও "তুই" এর ষোলটি প্রতিশব্দ আছে। শিশু, ছাত্র ও ভৃত্যদের সম্বোধন করবার জন্য আটটি ভিন্ন ভিন্ন কথা আছে। "পিতা" ও "মাতা"র নয়টি করিয়া প্রতিশব্দ, "পত্নী" ও "পুত্রে"র একাদশটি, "কন্যা"র নয়টি ও "স্বামী"র সাতটি প্রতিশব্দ বিদ্যমান।

এইবার আধুনিক জাপানী সামাজিক-জীবনের কথা বলি। মানুষ যে দিন জন্ম গ্রহণ করে, সেই দিন থেকেই তার সামাজিক-জীবনের আরম্ভ। সে জন্য শিশুর জন্ম থেকে আরম্ভ করে তার মৃত্যু পর্য্যন্ত ; যে দিন থেকে তার আশা আকাঙ্ক্ষার আরম্ভ, সেই দিন হতে সেইগুলির অবসানের দিন পর্য্যন্ত, আমাদিগকে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে।

শিশুর জন্মের পর, সপ্তম দিনে তার নামকরণ হয়, এবং সেই উপলক্ষ্যে বাটীতে ভোজ হয়। একুশ দিনে শিশুর মাতা আঁতুড়ঘর থেকে বাহিরে আসেন, ও এ দিনও শিশুর কল্যাণে অনেকে সুখাদ্য খেয়ে পরিতৃপ্ত হন। শিশুটি পুত্র হলে ত্রিশ দিনে ও কন্যা হলে একত্রিশ দিনে, মাতা তাকে নিয়ে পারিবারিক মন্দিরে যান। সেখানে দেবতাকে অর্পিত "সাকে" হইতে শিশুকে কিছু দেওয়া হয়, ও শিশুর মঙ্গলকামনা করে তার কপালে ঐ মদ্য স্পর্শ করান হয়। শিশুর মাতামহী তার জন্মের কথা শুনেই, তখনই তার জন্য একটি পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দেন। সর্ব্ব প্রথম শিশুটিকে সাধারণত বহুমূল্য "কিমোনো" দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী লোকেরা শিশুকে খুব আড়ম্বরের সহিত মন্দিরে নিয়ে যায়। বোধ হয় তাদের ব্যবসা খুব লাভজনক, ইহাই দেখাবার উদ্দেশ্য।

জাপানী স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের ধাঙড়, ভুটিয়া ও অন্যান্য পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকের মত পিঠে শিশু বাঁধিয়া বেড়ান। আশ্চর্য্য এই যে, যেই শিশু কন্যার বয়স ৪।৫ বৎসর হয়, অমনি সে তার কনিষ্ঠ শিশু ভাই বা বোনকে পিঠে বেঁধে বেড়ায়। অনেক সময় দেখা যায়, যে সব মেয়ে পিঠে চড়ে বেড়াবার বয়স পার হয় নি, তারাই আবার ছোট শিশুকে পিঠে বেঁধে বেড়াচ্ছে!

"শিশু ভাই বা বোনকে পিঠে বেঁধে বেড়ায়।"

জাপানীদের পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ রমণীদের, অতি সুন্দর। ইহা তাদের বেশ মানায়। কিন্তু আজ কাল অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা বিদেশীয় মেমসাহেবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বড়ই হাস্যকর আকার ধারণ করেন। এর প্রধান কারণ হচ্চে রাজ পরিবারের মহিলারা সকলেই বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরেন; আর সম্রাটই হচ্চেন সমাজের নেতা

ও তাঁর পরিবারস্থ লোকেরা যা করেন, সাধারণ লোকে তাই করে চরিতার্থ হয়। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ কেবল যে রমণীদের মানায় না তা নয়, পুরুষদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। সকল জাপানী পুরুষেরই এক একটা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ আছে, এটি পরে তিনি কর্ম্মস্থানে যান। কেমন করে কোথায় কি পরতে হয় তা কিন্তু জানেন না, ও জানবার যে ইচ্ছা আছে তাও বোধ হয় না। একে ত খর্ব্বাকৃতি, তার উপর মেঝের উপর হাঁটু-গেড়ে বসে বসে পাগুলি বাঁকা হয়ে গেছে। এক ব্যঙ্গপ্রিয় বিদেশী পর্য্যটক জাপানে এসে তাঁর বন্ধুকে এক পত্রে লেখেন, এখানকার সকল পুরুষই দেখ্‌চি হ্যামলেটে স্যার হেন্‌রি অর্‌ভিঙ (বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা)! স্যর হেন্‌রি অর্‌ভিঙ বক্রপদ ছিলেন। জাপানী পরিচ্ছদে জাপানী পুরুষের বক্রপদ ঢাকা পড়ে, কিন্তু প্যাণ্টালুন পর্‌লে বক্রতা বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বিদেশী পোষাকে এঁদের দেখ্‌লে বোধ হয়, পোষাকের সঙ্গে শরীরের এবং পোষাকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ চলেচে। পোষাক, শরীরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ যেন বিচ্ছিন্ন কর্‌তে ইচ্ছুক; আবার পোষাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি কেহ কাহারও সঙ্গে মিলিত হতে অনিচ্ছুক। "কোট" বল্‌চে আমি স্বাধীন, "ওয়েষ্ট্‌কোট" প্যাণ্টালুনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌তে চায় না, তাই প্রভুর পেটের উপর উঠে রয়েচে। "টাই," বাঁধবার দোষে বোধ হয়, "কলার" ছেড়ে উপরে উঠ্‌তে চাইচে। জাপানী "সাহেব"কে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন একটা প্রাণহীন পুতুলের উপর পোষাকগুলো চড়িয়ে রাখা হয়েচে!

জাপানী ছোকরার উচ্চাভিলাষ হচ্চে, "সাহেব" সাজা। প্রায়

প্রত্যেক জাপানী পুরুষেরই এক একটা "ফ্রক্‌কোট" আছে। এটা পরলেই, যেমন করেই পরুক না কেন, সাহেবীর চূড়ান্ত হ'ল বলে বিশ্বাস। তাই ছুটির দিনে, বা পর্ব্বের দিনে জাপানী একটি "ফ্রক্‌কোট" পরে বাহির হয়। এই "ফ্রক্‌কোট"গুলি কতকাল আগে তৈয়ারি হয়েচে তা কেউ বল্‌তে পারে না।

"ফ্রক্‌কোট" একটা পর্‌লেই চূড়ান্ত হ'ল। সাধারণ একটা প্যান্টা-লুন, পায়ে সাধারণ জুতা, বৃষ্টি হলে উঁচু কাষ্ঠ-পাদুকা, গলায় "টাই" "কলার" বিষম কলহে প্রবৃত্ত, পরস্পর পৃথক্‌ হবার চেষ্টা কর্‌চে; মাথায় একটা টুপি, অভাবে মেয়েদের "বনেট"!

হে "ফ্রক্‌কোট," জাপানীদের জিহ্বার দোষে তুমি এখানে "হুরাক্কু কোত্তো" নামে পরিচিত! তোমার অসীম সম্মান। তুমি সাধারণ মুটে মজুর হতে, যারা রোজ আনে রোজ খায়, "ব্যারণ," "ভায়কাউণ্ট্‌," "কাউণ্ট" পর্য্যন্ত, যাদের সংখ্যা আকাশের তারকার মত অগণ্য, ও পকেট মরুভূমির মত শূন্য,—সকলেরই স্কন্ধে চড়ে বেড়াও! তোমাকে পরিধান করে এদেশে যাওয়া যায় না এমন স্থান নেই। তুমিই প্রাতঃকালে মর্ণিংকোটের কাজ কর, দ্বিপ্রহরে "ফ্রক্‌কোট" হও, সন্ধ্যায় "ঈভনিং-কোট" হয়ে "সাহেব"দের সঙ্গে খানা খেতে যাও, থিয়েটার দেখ্‌তে যাও! তুমি গরীব লোকের কত পয়সা বাঁচিয়ে দাও, কারণ তুমি থাকলে আর কাকেও দরকার নেই। তুমি নিজে ধন্য, যাদের কাছে থাক তাদেরও ধন্য কর। তোমাকে গায়ে তুলেই ত এদেশে লোকে "হাইকারা," অর্থাৎ "হাই কলার" কি না উঁচু "কলার," বা যে উঁচু "কলার" পরে, এককথায় সৌখীন বাবু নামে পরিচিত হয়!

য়ুরোপীয় পোষাকের সঙ্গে জাপানীরা প্রায়ই জুতা পরেন, তবে বৃষ্টি হলে অনেক সময় ফ্রককোটধারী জাপানীকে "গেতা" পরতেও দেখা যায়; নইলে জুতা খারাপ হয়ে যাবে! ফিতা বাঁধা জুতা খুব কম লোকেই

"হাইকারা।"

পরেন, কেন না ফিতা বাঁধতে কষ্ট, আর এসিয়ার লোকের বলা অভ্যাস—কাজ কি ঝঞ্ঝাটে? জুতা পরলে এঁদের বড়ই কষ্ট বোধ

হয়, সুবিধা পেলেই জুতাটি খুলে পা মুড়ে জাপানী ধরনে বসেন। ট্রেনে প্রায়ই এরূপ দেখা যায়।

পুরুষদের দৈহিক গঠন ভাল নয়। জাপানী পুরুষের মুখে বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে "এক্স্‌প্রেসন্", ইহাদের মুখে তাহার একান্ত অভাব। সকলের মুখেই একটা নির্ব্বোধ, কঠোর, অমার্জ্জিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এদের অনুচ্চ নাসিকা, ক্ষুদ্র চক্ষু ও উচ্চ গণ্ডাস্থি মোঙ্গোলীয় উৎপত্তির পরিচয় দিতেছে।

কিছুকাল আগে এদেরও চীনাদের মত মাথায় লম্বা বিনুনী (pigtail) ছিল। বর্ত্তমান সম্রাট একদিন হুকুম দিলেন, সকলকেই লম্বা টিকি কাট্‌তে হবে। সম্রাটের হুকুম! সকলেই দ্বিরুক্তি না করে টিকি কেটে ফেল্‌লেন। এক বৃদ্ধার মুখে শুনেছি টিকি কাটার দিন, অনেক লোক এই বংশপরম্পরাগত সম্পত্তি নাশের শোকে অনাহারে থেকে প্রচুর ক্রন্দন করেছিলেন! ৩ তিন দিন ঘুমুতে পারেন নি! হবেই ত; কত শত সহস্র বৎসরের রীতি একদিনে উৎপাটিত হলে কার না কষ্ট হয়! আজকাল এঁরা খুব ছোট ছোট করে চুল কাটেন। মাথা শীতল রাখবার জন্য এমন করেন তা বল্‌তে পারি না; কারণ, এখানকার দারুণ শীতে মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকবারই কথা; তার জন্য স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। এঁরা খুব মিতাচারী, পয়সা বাঁচাবার জন্য এরূপ করা অসম্ভব নয়। যাঁরা বড় বড় চুল রেখে টেড়ি কাটেন, তাঁরা "হাইকারা" আখ্যা লাভ করেন। দাড়ি গোঁফ প্রায় সকলেই কামান। শুধু দাড়ি গোঁফ বল্‌লে সম্পূর্ণ হবে না, কপাল ও ভ্রূর কতক অংশও কামান। খুব কমলোকেই স্বহস্তে কামাতে পারেন, সেজন্য

বিরল সন্নিবিষ্ট খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফে মুখখানি কদম্ব পুষ্পের আকার ধারণ করবার আগে কামান না।

সুন্দরী।

যাঁরা গোঁফ রাখেন, কেশের অল্পতাহেতু তাঁদের গোঁফ অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। যাত্রার দলে গুম্ফহীন ব্যক্তি তৈয়ারি "গোঁফ" পর্‌লে যেমন হয়, তেমনি। যেন আঠা দিয়ে লাগিয়ে-রাখা হয়েচে।

নাক, চোখ, মুখ ও দেহের গঠন, সব বিষয় ধরলে জাপানী রমণীর মধ্যে নিখুঁত সুন্দরীর সংখ্যা অল্প। তবে এঁদের প্রত্যেকের মুখে এমন একটা কমনীয় ভাব আছে, যা বড়ই মনোহারী। এঁদের প্রতি কথায় সুশিক্ষা ও সুমার্জ্জিত অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন সহজ সুন্দর ও শান্ত। তাতে ব্যস্ততা নাই, অথচ জড়তারও সম্পূর্ণ অভাব। কবি জাপানী সুন্দরীর যে নিখুঁত ছবি এঁকেচেন, তা পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

মূল-পাপড়ির জড়িমা-জড়িত আধ বিকশিত আঁখি,
উজ্জ্বল যেন ছুরির মতন, শান্ত যেন গো পাখী!
সুন্দর কিবা দীর্ঘ ও গ্রীবা, বদন ডিম্বাকার,
বক্ষ ও উরু নহে নহে গুরু, ক্ষীণ পানি পাদ তার ;
পাণ্ডু বদন, পাণ্ডু বরণ, মাথায় কেশের রাশি,
অতুল শিল্প ওষ্ঠ-অধরে আধ-বিকশিত হাসি!*

সত্য সত্যই এঁদের "মাথায় কেশের রাশি।" ঘন কৃষ্ণ কেশ এলাইয়া দিলে কটিদেশের বহু নিম্নে পৌঁছে। এত প্রচুর সুন্দর কেশ জগতের আর কোনো দেশের রমণীর মস্তক ভূষিত করে কি না জানি না! এই কেশই জাপানী-রমণীর শ্রেষ্ঠ ধন। এবং ইহা পরিত্যাগ করতে জাপানী-রমণীর যত কষ্ট এমন আর কিছুতে নয়। গভীর বিশ্বাস, বা বুকভরা প্রেমের তাড়নাতেই তিনি এই অমূল্য নিধি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে বিসর্জ্জন দিতে পারেন। প্রাচীন প্রথানুসারে রমণী বিধবা হলে, তাঁর কেশের কিয়দংশ কর্ত্তন করে স্বামীর শবাধারে রাখেন;

* শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "তীর্থ-সলিল"।

চুলবাঁধা।

কুন্তলীন প্রেস।

শবের সহিত তাহা প্রোথিত হয়। এই কেশের পরিমাণের কিছুই স্থিরতা নাই, সাধারণত য সামান্য। কিন্তু আমরণ যিনি মৃতস্বামীর স্মৃতি বুকে ধরে রাখ্‌বার জন্য স্থির করেচেন; জীবনে যিনি প্রিয়তম ছিলেন, মৃত্যুর পরও তাঁকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলে পূজা করবার ইচ্ছা করেচেন, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন। স্বহস্তে দীর্ঘ, সুন্দর, চিক্কণ কেশরাশি কেটে ফেলে, এই অতুলনীয় প্রেমের দান তাঁর দেবতার পদে রেখে দেন। আর কেশ বর্দ্ধিত হতে দেন না।

অন্যান্য দেশের রমণীর মত, এঁরাও কেশের পারিপাট্য সাধনে যথেষ্ট যত্ন করেন। নানারকম চুলবাঁধা আছে। জাপানী ধরণের চুলবাঁধাগুলি অতি অপরূপ; সেরূপ চুল বাঁধাতে সময়ও যথেষ্ট লাগে। স্বহস্তে এরূপ চুল বাঁধা অসম্ভব; তাই চুল বাঁধিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক (রমণী) আছে। তাহারা গৃহস্থের বাটীতে বৈকালে এসে মেয়েদের চুল বেঁধে দিয়া যায়। একবার চুল বাঁধলে তিন চার দিন থাকে। প্রত্যেকবার চুল বাঁধার জন্য ৩ হইতে ৫ পয়সা খরচ। কেহ কেহ মাসিক বেতনেও কেশবিন্যাসকারিণীকে নিযুক্ত করেন। এরা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করে। এরূপ চুল বাঁধ্‌লে বালিসে মাথা দিয়া শয়ন করা যায় না, সেজন্য রমণীদের জন্য স্বতন্ত্র বালিস আছে। বালিসটা আর কিছু নয়, দৈর্ঘ্যে এক বিঘৎ, উচ্চে প্রায় ৬ ইঞ্চ, প্রস্থে ৩ ইঞ্চ একখণ্ড কাষ্ঠ। কাষ্ঠ খণ্ডের উপরার্দ্ধ হাঁড়িকাঠের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কর্ত্তিত। রমণীরা তাঁদের গ্রীবা এই খাঁজের মধ্যে স্থাপন করে নিদ্রা যান। মাথা শূন্যে থাকা হেতু চুল বাঁধা নষ্ট হয় না।

কেশবিন্যাসকারিণী সঙ্গে ক্ষুর লইয়া আসে, কারণ জাপানী স্ত্রী-

লোকেরা মুখের সর্ব্বত্রই কামান! ইহার প্রয়োজন কি তা বুঝতে পারি না। আজ কালকার মেয়েরা বিদেশী ধরণ ও জাপানী ধরণ মিশ্রিত করে চুল বাঁধ্‌বার এক নূতন ধরণ উদ্ভাবন করেচেন। অল্পবয়স্কা বালি-

বালিকা।

কারা অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মতই বিনুনি বেঁধে ঝুলিয়ে দেন। ইহারা চুলে ফুল পরেন, সাধারণত কৃত্রিম। জাপান, রেশম বা

মখমল দ্বারা কৃত্রিম ফুল তৈয়ারি বিষয়ে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করেচে। রিবন বা রঙিল ফিতাও কেশের সৌন্দর্য্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। ফিতা চুলের উপর জড়ান হয় না, ফুলের মত কেশের সঙ্গে কাঁটাদ্বারা সংযুক্ত করে রাখা হয়। যে চিরুণি ব্যবহৃত হয় তা রমণীর অবস্থা অনুসারে স্বর্ণমণ্ডিত বা মূল্যবান্ প্রস্তরে মণ্ডিত থাকে। অনেক সময়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্প বা প্রজাপতি কেশের শোভাবর্দ্ধন করে। চুলের কাঁটাগুলিও স্বর্ণ, রৌপ্য, ঝিনুক বা "ল্যাকার" নির্ম্মিত হয়।

বলা বাহুল্য আজ কালকার শিক্ষিতা মেয়েদের সাজসজ্জা, চুলবাঁধা প্রভৃতি দেখে সেকেলে বৃদ্ধারা বড় দুঃখ প্রকাশ করেন। এ দুঃখ যে নিঃস্বার্থ তা বল্‌তে পারিনা। নিজে যা করতে পারিনা বা করবার উপায় নাই, তা পরে করচে দেখ্‌লে স্বভাবতই দুঃখ হয়। অনেকেই, যাঁরা পরের ভাল দেখ্‌তে পারেন না, আজ কালকার মেয়েদের "হাইকারা" ব'লে থাকেন।

জাপানী-রমণীর পরিচ্ছদ এদেশের অন্য সব পদার্থের মতই অপূর্ব্ব। এ পরিচ্ছদে সুন্দরীদের অনেকটা প্রজাপতির মত দেখা যায়। মনে হয় তাঁরা এত কোমল ও ক্ষণস্থায়ী যে অল্প আঘাতে বা কষ্টে প্রজাপতির মতনই ধরাপৃষ্ঠ হতে লোপ পাবেন। কিছুকাল এদেশে থাক্‌লে এ ধারণা যে ভ্রান্ত তা বুঝ্‌তে পারা যায়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও এঁদের মত কষ্টসহিষ্ণু রমণী আছেন কি না সন্দেহ।

রমণী ও পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায় একই রকম, কেবল বস্ত্রের রং ও অন্যান্য সামান্য প্রভেদ। একটি লম্বা আল্‌খেল্লা, হাতা আছে; এবং ঠিক হাতের নিচে খানিকটা কাপড় ঝুলে পড়ে দুইটা বৃহৎ বগলির সৃষ্টি

করেচে; এই বগলি দুটির নাম "সোদে"। স্ত্রীলোকের "সোদে" পুরুষের অপেক্ষা কিছু বেশী দীর্ঘ। এই "সোদে" পকেটের কাজ করে; তার ভিতরে স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিষ সবই থাকে। একখানি ক্ষুদ্র আয়না, ছোট একখানি চিরুণি, চিঠি পত্র রুমাল ও পাতলা কাগজ, যা নাক পরিষ্কার করতে, মুখ পুঁছতে, নানান্ কাজে ব্যবহৃত হয়। সকলের উপরের যে আল্‌খেল্লাটি সেইটিই প্রধান পোষাক, ও রেশম, "ক্রেপ" বা সুতার কাপড়ে নির্ম্মিত। ভিতরের কাপড়গুলিও সবই আল্‌খেল্লার মত তৈয়ারি এবং খুব রঙিল; গোলাপী, লাল, সবুজ, সোনালী, নানা রকম রঙ। সে গুলি সাধারণত রেশমনির্ম্মিত। শীতের পোষাক ঘন রঙের; বসন্তে ও গ্রীষ্মে অপেক্ষাকৃত ফিকে রঙের পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হয়।

শীতের "কিমোনো"র মধ্যে খুব পাতলা করে তুলা ভরে দেওয়া হয় ব'লে একে "ওয়াতা ইরে" বা তুলাভরা পোষাক বলে।

রঙিল কাপড়ের গলবন্ধ দিয়া গলদেশ ঢাকা থাকে। একটি পিন দ্বারা গলবন্ধটি আটকাইয়া রাখা হয়। সম্মুখদিকে কিমোনোর মধ্যভাগ গলা হতে পা পর্য্যন্ত খোলা। দক্ষিণদিকের অংশ দেহের উপর রেখে, বাম দিকের অংশ তার উপর দিয়ে একটি কোমরবন্ধ দ্বারা বন্ধ করা হয়। মেয়েদের কোমরবন্ধটি প্রায় এক ফুট চওড়া ও কয়েক হাত লম্বা। কোমরে বেশ করে জড়িয়ে শেষে পশ্চাদ্ভাগে একটি ফাঁস দিয়ে বাঁধা হয়। প্রথম প্রথম, মেয়েরা বিনা কারণে পিঠে কেন যে একটা বোঝা বয় তা কিছুই বুঝতে পারতুম না!

এই "ওবি"টি সাটিন, মখমল, "ক্রেপ" বা সাধারণ কাপড়ে নির্ম্মিত।

একটি ভাল "ওবি"র মূল্য অনেক। অনেক সময় "ওবি"টির মূল্য বাদ-বাকী সমস্ত পরিচ্ছদ অপেক্ষা অধিক! "ওবি"র উপর একটি সরু রেশমী ফিতা জড়ান; সামনের দিকে সরু ফিতাটির মুখ স্বর্ণ নির্ম্মিত বা অবস্থা বিশেষে মুল্যবান্ প্রস্তর মণ্ডিত আংটা দ্বারা আটকে রাখা হয়। এই উপায়ে "ওবি"টিকে স্বস্থান ভ্রষ্ট হতে দেওয়া হয় না। এই ফিতাটিকে "ওবিতোমে" বলে, এবং ইহা জাপরমণীর স্বল্পসংখ্যক অলঙ্কারের মধ্যে একটি।

পুরুষের "ওবি" স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা প্রস্থে অনেক কম। মেয়েরা ষোল সতের বৎসর পর্য্যন্ত খুব রঙিল "ওবি" পরেন। বয়সের বৃদ্ধির সহিত উজ্জ্বল, রঙিল "ওবি"র স্থান, বহুমূল্য হলেও সরল, সাধারণ, অরঞ্জিত "ওবি"র দ্বারা অধিকৃত হয়।

এঁরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত খালি পায়ে থেকে নানা প্রকার ব্যারাম ডেকে আনেন না। এঁরা মোজার পরিবর্ত্তে "তাবি" পরেন। "তাবি" আকারে মোজারই মত, তবে উচ্চতায় পায়ের গাঁটের উপর পৌঁছায় না। এ গুলি তূলার কাপড়ে তৈয়ারি, ও পায়ের পশ্চাদ্ভাগে গোড়ালি হতে দু তিন ইঞ্চ্ উপর পর্য্যন্ত তিন চারটি আংটা দ্বারা বদ্ধ থাকে। পায়ের বুড়া আঙুল ও অন্য চারটি আঙুলের মাঝে একটি খাঁজ আছে। কাষ্ঠ পাদুকা পরবার সময় ঠিক খড়ম পরার মত বুড়া আঙুলটি একধারে, ও অন্যান্য আঙুল অন্যধারে থাকে। ভদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে "তাবি" না পরে বাহির হওয়া নীতি বিরুদ্ধ। এঁরা সকল সময়েই শ্বেত "তাবি" পরেন। পুরুষেরাও সাধারণত তাই পরেন, তবে সময় সময় কালো রঙের "তাবি"ও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

"গেতা" বা কাষ্ঠপাদুকা নানা প্রকার আছে। সাধারণ গেতা প্রায় ২ ইঞ্চ্ উঁচু। বৃষ্টিবাদল ও বরফ্‌পাতের সময় ব্যবহারের জন্য সাধারণ গেতা অপেক্ষা দ্বিগুণ উঁচু গেতা আছে। এই গেতাগুলির সম্মুখাঙ্কের উপর অয়েলক্লতের একটা ঢাক্‌নি আছে; এ থাকাতে "তাবি" ভিজ্‌তে পায় না। এ ছাড়া "জোরি" আছে, যা বৃষ্টিহীন উষ্ণ দিনে ব্যবহৃত হয়। এ গুলি মাটিতে লেগেই থাকে ও পায়ে দিতে বড় আরাম। ইহা খড় বা চাপ দ্বারা একত্রীকৃত পশমে (felt) নির্ম্মিত হয়।

জাপানী রমণীর অলঙ্কার যৎসামান্য। এঁরা সমস্ত দেহ ভারি ভারি সোনা রূপার তালে ঢেকে কুরুচির পরিচয় দেন না। দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করে অলঙ্কার পরবার সাধ এঁদের নাই। মস্তকে চিরুণি, কৃত্রিম, রেশম বা ধাতু নির্ম্মিত প্রজাপতি বা পুষ্প, ক্ষুদ্র সোনার ঘড়ি ও চেইন ও অঙ্গুরীয়, ইহাই সমস্ত অলঙ্কার। কত আড়ম্বরহীন, অথচ কত সুন্দর! এঁদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির নির্ব্বাচন দেখ্‌লে এঁদের রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে আজকাল অলঙ্কারের ওজনের প্রতিই লক্ষ্য, কারুকার্য্যের প্রতি কারও লক্ষ্য নাই। দিন দিন আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান লোপ পাচ্চে।

এঁদের রমণীরা সকল অলঙ্কারের মধ্যে আংটীই বেশী পছন্দ করেন। সে জন্য প্রত্যেক রমণীর আঙুলে আংটি দেখা যায়।

রমণীর জীবন এখানে আমাদের দেশের মত একঘেয়ে নয়। "কুট্‌না কুট্‌তে" ও "বাট্‌না বাট্‌তে" ও রন্ধন কর্‌তে সমস্ত সময় কেটে যায় না। এঁরা বেশ একটু বিশ্রাম করবার সময় পান। বহির্জগতে বেরিয়ে

বিধাতার মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস ফেলবার ও সূর্য্য কিরণ গায়ে লাগাবার অধিকার তাঁদের আছে। তাই দিনের মধ্যে অন্তত একবার বেড়িয়ে এসে, ভাত হজমের ব্যবস্থা করে, অম্লরোগ ও অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

প্রাতে প্রায় ৫ টার সময় রমণী গাত্রোত্থান করেন, বিশেষতঃ তিনি যদি বাটীর গৃহিণী বা বিবাহিতা হন। স্বামীর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই জাপানী স্ত্রী প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে প্রাতঃকালীন আহারাদি প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই পরিচারিকা রন্ধন-শালায় উননে আগুন দিয়াছে, ও বারান্দার "আমাদো" গুলি খুলে দিয়েচে। জাপানী পরিবারে, যাঁদের অবস্থা খুব ভাল, অনেক চাকরাণী প্রতিপালিত হয়। বাটীর মেয়েদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি চাকরাণী থাকে। সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে একজন বা দুইজন থাকে। জাপানে পরিচারক প্রায় কেহই নিযুক্ত করেন না। তবে অবস্থাপন্ন লোকের বাটীতে "কুরুমা" টানবার জন্য একটি পুরুষ নিযুক্ত থাকে, সে তার অবসর সময়ে অন্যান্য ফাই-ফরমাইস ও খাটে।

"আমাদো" খুলবার শব্দে, ও ঘরে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করাতে ছেলে, বুড়ো, বিবাহিত, অবিবাহিত, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই উঠে পড়েচে। তারপর মুখধোয়ার জায়গায় খুব হুড়াহুড়ি পড়ে যায়। মুখ প্রক্ষালনাদির পর যে যার ঘরে এসে দেখে ইতিমধ্যে বিছানাগুলি তুলে "তোদানা"র মধ্যে রাখা হয়েচে, ঘরের চতুর্দ্দিক্ খোলা, বেশ রোদ এসে পড়েচে। ঘরে আসবাব পত্র কিছুই নাই, তাহা শূন্য বল্‌লেই হয়। মাঝখানে কেবল একটি "হিবাচি"তে দুখানা জলন্ত অঙ্গার বেশ করে ছাই দিয়ে ঘেরে রাখা

হয়েচে, ও তার উপর একটা ছোট লোহার কেট্‌লিতে জল গরম হচ্চে। নিকটেই একখানা ছোট নীচু টেবিলের উপর জাপানী চায়ের সরঞ্জাম; মুখ ধুয়ে এসে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য কয়েকটা নুনে 'মজান' কুল। "হিবাচি"র পাশে একটা ছোট ঝুড়িতে কয়লা।

গৃহিণী কর্ত্তার পরিচ্ছদাদি পরবার সময় সাহায্য করেন, ও হুজুরে হাজির থাকেন। এধারে বাটীর ছেলে মেয়েরা পাশের ঘরে মহা কলরব করে খেতে বসে গেছে। কর্ত্তার কাপড় পরা হলে, যে তাকের উপর পারিবারিক দেবতা আছেন, গৃহিণী সেখানে ধূপধূনা জ্বালিয়ে দেন ও অল্প চালের নৈবেদ্য দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর আরাধনা করেন। ওধারে ছেলে মেয়েরা আহার সাঙ্গ করে ইস্কুলে যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেচে। মাতাকে মেয়েদের সাজসজ্জা করিয়ে, তাদের চুলে বিনুনি বেঁধে সব ঠিক করে দিতে হবে। ছেলেরা নিজেরাই কাপড় পর্‌চে, তবে তাদেরও খাতা বই প্রভৃতি বেঁধে দিতে হবে, আর "ওবেন্তো" বা দ্বিপ্রহরের জল খাবারের বাক্স ভুল্‌লেও চল্‌বে না। প্রাতঃকালে এই সময়, যখন ছেলে মেয়েরা ইস্কুলে যায় ও কর্ত্তা আপিষে বেরোন, গৃহিনা ও চাকরাণী প্রভৃতি বড়ই ব্যস্ত থাকেন। বেলা ৭ টা ৭½ টার মধ্যেই ছেলে মেয়েরা ইস্কুলে রওয়ানা হ'ল।

তারপর কর্ত্তা ও গিন্নীর আহার। আহারের পর গিন্নী কর্ত্তৃক কর্ত্তার "সাহেবী" পোষাক পরিধানে সহায়তা করণ, ও কর্ত্তার "কুরুমা" চড়ে আপিষে প্রস্থান। গিন্নী দুয়ারের কাছে হাঁটুগেড়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বল্লেন, "ইত্তে ইরাষ্‌যাই মাষি" বা গিয়ে আসুন। কর্ত্তা বেরিয়ে যাবার পর প্রায় দু' ঘণ্টা ঘর দুয়ার ঝাঁট দেওয়া, বিছানা রৌদ্রে দেওয়া,

"ইত্তে ইরাষ্‌ষাই মাষি"

কাঠের বারান্দা বেশ করে ঝাঁট দিয়ে ভিজা কাপড়ে ঘষে' মসৃণ করা প্রভৃতি কাজে কেটে যায়। (প্রত্যহ ঘর দুয়ার পরিষ্কার করলেও, অনেক ময়লা কাঠের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বাটীর তলায় পড়ে। অনেক ধুলা মেঝের মাদুরের মধ্যে প্রবেশ করে। সে জন্য মধ্যে মধ্যে পুলীসের তত্ত্বাবধানে সমস্ত বাটী পরিষ্কার করতে হয়। সে সময়ে মেঝের "তাতামি" বা মাদুর উঠিয়ে রৌদ্রে দেওয়া হয়, ও তৎপরে যষ্টিপ্রহারে ধূলিকে মাদুর পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়। বাটীর তলার সমস্ত ময়লা বার করে দিয়ে চুণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এক এক দিন এক এক পাড়ার যাবতীয় বাটী পরিষ্কার করা হয়। এর নাম "ওসোজি।") তারপর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গিন্নীর অবকাশ। তিনি সে সময়ে খবরের কাগজ পড়েন, দৈনিক

হিসাব লেখেন, জিনিষ পত্রের জন্য সদাগরকে বলে দেন। চাকরাণীরা সে সময়ে কলের কাছে বা কুয়ার কাছে খুব জটলা করে; চাল ধোওয়া, কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে। কর্ত্তাকে আপিষে পৌঁছে দিয়ে "কুরুমায়া" এই সময় স্নানাগারের চৌবাচ্ছা ঠাণ্ডা জলে ভর্ত্তি করে।

জাপানীরা যে যেখানে থাকুক্ না কেন, ঠিক দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ণ ভোজন করে। ছুটির দিন না হলে এ খাওয়াটা খুব সাধারণ গোছের হয়, কারণ ছেলে মেয়ে কর্ত্তা সকলেই বাহিরে; বাটীতে লোক খুব কম। আহারের পর, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, গৃহিণী ও বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা একটু ঘুমিয়ে নেন। তারপর তাঁরা একটু বেড়িয়ে আসেন। হয় দোকানে গিয়ে জিনিষ পত্র খরিদ করেন, না হয় বন্ধুর বাটীতে যান। সন্ধ্যায় কর্ত্তার প্রত্যাবর্ত্তনের আগেই গৃহিণীকে ফিরতে হবে, কারণ স্বামীর প্রত্যাগমনের সময় দরজার কাছে বসে তাঁকে অভ্যর্থনা করা জাপানী স্ত্রীর একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ প্রথাটি অতি সুন্দর। সারাদিন খেটেখুটে মানুষ যখন শ্রান্ত হয়ে বাটী ফেরে, তখন গৃহিণী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হতে কার না ইচ্ছা হয়!

যে দিন গৃহিণী বাহিরে কোথাও না যান, সে দিন হয়ত পরিচারিকাদের সঙ্গে সেলাইকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। জাপানী স্ত্রীলোকেরা সকলেই সেলাই জানেন ও নিজেদের "কিমোনো" প্রভৃতি বাটীতে প্রস্তুত করেন। ছেলেদের পোষাকও মেরামত করে দেন।

বিকাল বেলা ৩টা ৩½টার মধ্যেই ছেলে মেয়েরা ইস্কুল থেকে ফিরে আসে। নিস্তব্ধ বাটী আবার তাদের হর্ষ কোলাহলে মুখরিত হয়ে

ওঠে। ঐ সময় কেশবিন্যাসকারিণী এসে বাটীর মেয়েদের চুল বেঁধে দিয়ে যায়।

ছেলেরা বাটীর উদ্যানে ছুটাছুটি হুটোপাটি করে। মা মেয়েদের "কোতো" ও "সামিসেন" বাজাইতে শেখান ; কেমন করে চল্‌তে হবে, কি ভাবে প্রণাম কর্‌তে হবে ইত্যাদি আদব কায়দা শিক্ষা দেন। ছেলেরাও যাতে ইস্কুলের পড়া মুখস্ত করে, সে দিকেও নজর রাখেন।

কর্ত্তা প্রত্যাবর্ত্তন করলে তাঁর আপিষের পোষাক ছেড়ে আরামদায়ক "কিমোনো" পরবার সময়ও গৃহিণী সহায়তা করেন। তারপর কর্ত্তার স্নান। জাপানে সকলেই সন্ধ্যায় দিনের কাজ শেষ হলে স্নান করেন। সুবিধা অনুসারে আহারের পূর্ব্বে বা পরে করেন। কর্ত্তার স্নান সমাপন হলে সকলে আহারে প্রবৃত্ত হন। জাপানী পরিবারে সন্ধ্যার আহারই প্রধান। এ সময়ে বাটীর সকলেই উপস্থিত থাকেন, তাড়াতাড়িও থাকে না ; কাজকর্ম্ম সেরে এসে মনটাও সকলেরই সুস্থির থাকে। সাম্‌নে দীর্ঘ রাত্রি নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য সকলকে আহ্বান কর্‌চে !

জাপানীরা সন্ধ্যা বেলায় বড় সকাল সকাল আহার করেন। বেলা ৬টার মধ্যেই আহার শেষ হয়। বৈকালে কিছু খান না বলেই বোধ হয় এমন করেন। দিনে কেবল তিনবার খান ; সকাল ৬ টায়, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যা ৬টায়। দুটি আহারের মধ্যের ব্যবধান বড় দীর্ঘ ব'লে বোধ হয়।

গ্রীষ্মকালে, সন্ধ্যাভোজনের পর প্রায়ই সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসেন। (জাপানী তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যখন বেড়াতে বেরোয়, তখন কখন কখন অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। স্ত্রী পিছনে পিছনে আস্‌চেন, আর স্বামী তাঁর কয়েক হস্ত আগে, যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব

দেখিয়ে যাচ্চেন। স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁট্তে এখনও অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন। স্ত্রীর পুঁটুলিটি বয়ে নিয়ে যেতেও "কিন্তু-কিন্তু" করেন। অনেক স্থলে বহিবার ইচ্ছাসত্তেও পাছে লোকে স্ত্রী ঘেঁষা ব'লে ভাবে এই ভয়ে বহেন না! এক জাপানী পরিবারে মহিলাদের নিকট শুনেছিলুম যে অনেক লোক আছে, যারা অন্ধকারে, বা যে রাস্তায় লোক চলাচল হয় না এমন স্থানে স্ত্রীর পুলিন্দাটি বয়ে নিয়ে যান; কিন্তু অদূরে যেই কাকেও আস্তে দেখেন অমনি বুঁচ্কিটি স্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দেন!

আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত বা বিদেশ-প্রত্যাগত জাপানী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বেড়াতে বাহির হন। কোন পরিহাসপটু য়ুরোপীয় বন্ধু ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছিলেনঃ—আজকাল জাপানীদের ধৃষ্টতা দেখ্লে অবাক্ হতে হয়। এদের সম্রাটের একমাইল পশ্চাতে সম্রাজ্ঞী যান, আর এরা কিনা স্বামী স্ত্রীতে পাশাপাশি বেড়াতে বেরোয়!

জাপানী সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী কখনও এক সঙ্গে এক গাড়ীতে বাহির হন না। সম্রাটের গাড়ীর বহুপশ্চাতে সম্রাজ্ঞী একখানা ঢাকা গাড়ীতে চড়ে যান। কারণ সম্রাট্ হলেন ঈশ্বর, আর সম্রাজ্ঞী? সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র!)

শীতের সন্ধ্যায় কাজ না থাক্লে কেহ বড় একটা বাহিরে যান না। সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা গল্প গুজবে, ও সেদিনকার ঘটনার আলোচনায় কেটে যায়।

ক্রমে রাস্তায় চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়; ক্লান্তিবশত, ঘুমে ছেলেদের চোখ জুড়ে আসে; অবশেষে তাদের কোলাহলও থেমে যায়।

রাত দশটার সময় বারান্দা ও জানালার "আমাদো" গুলো বন্ধ করে

দেওয়া হয়, যে যার ঘরে লেপের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে। বাহিরে গভীর নিস্তব্ধতা প্রহরীর মত সর্ব্বত্র বিরাজ করে।

যেদিন ভারতবর্ষ ছাড়ি, জাপান সম্বন্ধে মনে মনে একটা প্রকাণ্ড ধারণা গ'ড়ে তুলেছিলুম। জাপানের অদ্ভুত উন্নতির কথা শুনে মনে ভেবেছিলুন বুঝি বা জাপানের রাস্তা, ঘাট, অট্টালিকা; ট্রামগাড়ী, রেল-গাড়ী, গরুর গাড়ী; উদ্যান ও উপবন খারাপ হলেও অন্তত কলিকাতা অপেক্ষা ভাল। সেখানে অবশ্য সকলেই ইংরাজি বলে, অন্তত আমাদের মত। ইংরাজি না জেনে যে কিরূপে উন্নতি সম্ভব, তা তখন ভারতের রুদ্ধ আকাশতলে থেকে, বাল্যকাল হতে ইংরাজ ও ইংরাজের যা কিছু তার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপনে শিক্ষিত হয়ে ভাবতেই পারিনি। মনে করলুম এখানে বড় বাড়ীও নাই, গাড়ী ঘোড়াও নাই; ইংরাজি জানা লোক ত একজনও দেখ্‌লুম না, তবে কি উন্নতি করেচে? ভ্রান্ত আমি, পরাধীন জাতিতে জন্মগ্রহণ করে কেবল বাহ্যাড়ম্বরকেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা মনে করেছিলুম! ঘরের বাহির হতে দেখে ভিতর দেখা প্রয়োজন নাই ভেবেছিলুম। ছোট ছোট আড়ম্বরহীন কাঠের ঘরের ভিতরে কি উন্নতির স্রোতঃ প্রবাহিত, তা তখনও দেখিনি। আজ দেখে ভুল ভেঙে গেছে।

জাপানে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে এক জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলুম। তিনি বহু বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শিক্ষালাভ করেন, ও তখন তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ। দেশে থাকতে এঁর সহিত চিঠি পত্রাদি লেখা চল্‌ত এবং এইরূপেই আলাপ।

বাড়ীর সম্মুখে একটি কাঠের ফটক। তার মধ্য দিয়া প্রবেশ করে আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে বাটীর দরজা। এ দরজা আমাদের দেশের

মত নয়। এগুলি কাঠের তৈয়ারি কিন্তু কোন রকম কব্জা লাগান নাই। কাঠের চৌকাটের উপর খাঁজ কাটা আছে, তাহার উপর দরজাগুলি এক পার্শ্ব হতে অপর পার্শ্বে ঠেলে দেওয়া যায়। ভিতর দিকে দরজার গায়ে একটি ছোট ঘণ্টা লাগান আছে। দরজা ঠেল্‌লেই ঘণ্টার শব্দ হয় এবং গৃহস্থ বুঝ্‌তে পারেন কেহ প্রবেশ করিল। আমি প্রবেশ কর্‌তে একটি স্ত্রীলোক, পরে বুঝেছিলুম চাকরাণী, বাহির হয়ে এসে, সেই দুয়ারের উপর হাঁটুগেড়ে বসে বিনয়-নম্র শান্ত-মধুর স্বরে বল্‌ল "ইরাষ্‌ষাইমাষি।" কথাটার অর্থ তখন ঠিক বুঝিনি, পরে বুঝেচি ; অর্থ হচ্চে, আস্‌তে আজ্ঞা হউক বা আসুন। সব জাপানী বাড়ীতেই এই রকম। কার্ড্‌ পাঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, অনতিবিলম্বে চাকরাণী ফিরে এসে আমাকে প্রবেশ কর্‌তে বা উঠ্‌তে অনুরোধ করিল। পূর্ব্বে বলেচি জাপানী বাটীতে জুতা পায়ে প্রবেশ করা যায় না। সাধারণত ভূমি হতে প্রায় এক ফুট উচ্চে বাড়ী নির্ম্মিত হয়। জমির উপর বড় প্রস্তর খণ্ড ইতস্তত রেখে তার উপর কাঠের মাচা তৈয়ারি হয়, তার উপর বাড়ী হয়। বাড়ীর মেঝে সর্ব্বত্র পুরু মাদুরে ঢাকা, চল্‌তে বেশ নরম ঠেকে।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মেঝের উপর কার্পেট পাতা। কয়েকটি আলমারিতে অনেক ইংরাজি পুস্তক সাজান। চেয়ার, টেবিল, বাঁধান ছবি, প্রভৃতি সবই ছিল। কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘরে গিয়া দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘরের মেঝে শুভ্র মাদুরে ঢাকা। আসবাব পত্র কিছুই নাই। জাপানী ঘরের স্পষ্ট শূন্যতা বিদেশী অভ্যাগতকে অভিভূত করে ফেলে। কয়েকখানি তুলাভরা চতুষ্কোণ আসন পাতা, আসনের মাঝখানে পূর্ব্বে উল্লেখিত "হিবাচি"।

ঘরখানি দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লুম এ দেশীয় লোক কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মেঝেতে এক কণা ধূলি খুঁজে পাওয়া যায় না। দরিদ্রের গৃহও এত পরিষ্কার, ধূলিমলা বিহীন, যে তা দেখে আমাদের দেশের অনেক পদস্থ ব্যক্তি লজ্জিত হবেন।

কিছুক্ষণ পরে মিঃ ম—, জাপানী কথায় বল্‌তে হবে ম সান্‌, তাঁর ছোট কন্যা ও স্ত্রী সমভিব্যাহারে ঘরে প্রবেশ করলেন। স্ত্রী ও কন্যার সহিত আমাকে পরিচিত করে দিলেন। এই প্রথম বিদেশে এসে জাপানী বাটীতে ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিচয়। আমাদের দেশে ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়া দূরের কথা, তাঁদের মুখ দেখা ভার। দেশে কারও বাটীতে গেলে, অতিবড় বন্ধু হলেও, বহির্ব্বাটীতে বসে থাক্‌তে হয়। হয় হরে চাকর, নয় বামা চাকরাণী, (সাধারণত ময়লা কাপড় পরা) একখানা ছোট রেকাবিতে গোটাদুই রসগোল্লা, একগেলাস জল, ও ডিবাতে গোটাকত পান দিয়া যায়। ইহাই হইল চূড়ান্ত অভ্যর্থনা! ধূমপায়ীদের জন্য এর উপর হুঁকার ব্যবস্থা। বাটীর মেয়েরা ত বহির্ব্বাটীতে বেরোন না, যদি বা হঠাৎ কোনক্রমে সাম্‌নাসাম্‌নি পড়ে গেলেন ত সাত হাত ঘোমটা টেনে ছুট্‌! আমাদের দেশটা যেন পুরুষের দেশ, সেজন্য বিদেশীর পক্ষে, আমাদের পক্ষে যে নয় তাহা বলি না, অত্যন্ত নীরস ও মাধুর্য্যহীন। জাপানে কারও বাটীতে গেলে কথাবার্ত্তা, আমোদ প্রমোদে স্ত্রী পুরুষ নিঃসঙ্কোচে যোগ দেন, এবং অভ্যাগত ইহাতে যেরূপ নির্ম্মল আমোদ পান, বহির্ব্বাটীতে বসে রাশি রাশি মিহিদানা, মতিচুর, বোঁদে, রসগোল্লা খেয়ে সেরূপ আমোদ পাওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশে পেট-ভরান ছাড়া অন্য উপায়ে যে কাকেও

তৃপ্ত করা যায় ইহা ধারণাতেই আসে না। য়ুরোপ, আমেরিকার মত এখানেও খাওয়াটা প্রধান নয়, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে মিশে আমোদ করাটাই প্রধান।

মিসেস্ ম—ভাল ইংরাজি বল্‌তে পারেন না, তবুও ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলেন "এ দেশ কেমন লাগ্‌চে? এখানে বড় ঠাণ্ডা না?" তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বল্‌লুম "বড় সুন্দর দেশ।" তাঁর মুখ দেখে বুঝ্‌লুম অনেক কথা ক'বার ইচ্ছা কিন্তু কি করবেন ইংরাজি জানেন না, আমিও জাপানী ভাষায় "ন'য়ে আকার দিয়ে" পণ্ডিত।

চারজনে এক একখানি আসনে বসে "হিবাচি"তে হাত গরম করতে লাগ্‌লুম। চাকরাণী,—বামা চাকরাণীর মত ময়লা কাপড় পরা নয়, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—একখানি "ট্রে"র উপর চারিটি ছোট ছোট চীনা মাটির পেয়ালা ও একটি ছোট কেট্‌লিতে জাপানী চা আনিল। "ট্রে"টি নাবিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে অভিবাদন করিল, তারপর প্রত্যেক বাটিতে অল্প অল্প চা ঢেলে প্রত্যেককে এক এক পেয়ালা দিয়া গেল। অপর একটি 'ল্যাকার' পাত্রে কিছু জাপানী মিষ্টান্ন ও তাহা উঠাইবার জন্য দুটি কাঠি। হাত দিয়া কোন খাবার জিনিস তোলা জাপানী নীতি বিরুদ্ধ।

পূর্ব্বে একস্থানে বলেচি এ চা দুগ্ধ শর্করা বর্জ্জিত। জাপানী বাটীতে গেলেই, কি ইতর কি ভদ্র সকলেই এরূপ চা অভ্যাগতকে দেয়।

মিঃ মর সহিত নানা রকম কথাবার্ত্তা হতে লাগ্‌ল। মিসেস্ ম কয়েকখান চিত্রিত পোষ্টকার্ড্ ও ফোটোগ্রাফ আল্‌বাম লইয়া আসিলেন। ফোটোগ্রাফ আল্‌বামে বন্ধুবান্ধবের ছবি ও নিজেদের নানা রকম ছবি

ছিল। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকেও কালে ভদ্রে একখানা ছবি তোলান, কিন্তু এখানে ছবি তোলান একটা বাই। সহরের গলিঘুঁজিতে সর্ব্বত্র ফোটোগ্রাফারের দোকান। ধনীর কথায় কাজ নেই, মুটে মজুরেরাও বছরে দু একবার ছবি তোলায়। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ফোটোগ্রাফ গুলি দেখিয়ে থাকেন; ইহা সময় কাটাবার বেশ উপায়। চিত্রিত পোষ্ট্ কার্ড্ গুলি এই প্রথম দেখ্লুম। । এমন পদার্থ যে আছে দেশে থাক্তে তাও জানতুম না! এখানে ক্ষুদ্রগ্রামেও দুচার খানা চিত্রিত পোষ্টকার্ডের দোকান আছে, সেখানে ঐ স্থানের দর্শনীয় স্থান প্রভৃতির ছবি বিক্রয় হয়। কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘট্লে তার পর দিন উহার হাজার হাজার ছবি বিক্রীত হয়।

অনেকগুলি সেণ্ট্ লুই প্রদর্শনীর ছবি দেখ্লুম। মিঃ ম প্রদর্শনী দেখ্তে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে আসেন। কথাবার্ত্তায় প্রায় দ্বিপ্রহর হয়ে এল। জাপানী বাটীতে দ্বিপ্রহর, ভোজনের সময় জানতুম তাই বিদায় চাইলুম। ওঁরা মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রন কর্লেন, অগত্যা থেকে যেতে হল। ব্রাহ্মনের পক্ষে নিমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করা কঠিন ব্যাপার!

খাবার ঘরে একটি সুন্দর টেবিলের চারিধারে চেয়ার সজ্জিত। টেবিলটি য়ুরোপীয় ধরণের। প্রকৃত জাপানী খাবার টেবিল খুব নীচু; মাদুরের উপর আসন পাতা থাকে, তার উপর হাঁটুগেড়ে বসে খাওয়া হয়। জাপানী সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে দু প্রকার ব্যবস্থাই থাকে। আমি সম্প্রতি জাপানে এসেচি, সেই জন্যই বোধ হয় আমার কষ্ট হবে মনে করে য়ুরোপীয় টেবিলে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। চাকরাণী নিঃশব্দে পরিবেষণ করতে লাগ্ল। জাপানীরা কাঁটা চামচের পরিবর্ত্তে দুটি কাঠি

আহার।

ব্যবহার করেন। কাঠি সামান্য কাঠেরও হয় আবার বহুমূল্য হস্তিদন্তেরও হয়ে থাকে। আমাকে কাঠি এবং কাঁটা চামচ দুইই দেওয়া হয়েছিল। আমি তখনও কাঠি ব্যবহারে অভ্যস্ত হইনি, তাই কাঁটা চামচ ব্যবহার করলুম; (কাঁটা চামচ ও প্রায় 'তথৈবচ') ওঁরা কাঠি দ্বারা ভাত, মৎস্য, প্রভৃতি অতি সুচারুরূপে আহার করতে লাগলেন। প্রথমেই একটা মৎস্য ও শাক সবজির স্যুপ বা ঝোল সুন্দর ল্যাকারের বাটীতে প্রত্যেককে দেওয়া হ'ল। মৎস্যের ঝোল বলিতে আমাদের দেশের মত নানাবিধ মসল্লা দ্বারা প্রস্তুত ঝোল বুঝবেন না। অল্প একটু নুন দেওয়া, গরম-জলে কেবল সিদ্ধ, খাইতে মন্দ নয়। তার পর ছোট ছোট চীনামাটির বাটিতে ভাত দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশের মত থালাতে ভাত

দেওয়ার রীতি নাই। ভাত আমাদের ভাতের মত ছাড়া ছাড়া নয়, কারণ এখানে ভাতের ফেণ বা মাড় ফেলে দেওয়া হয় না। ভাত সুন্দর-রূপে সিদ্ধ হবার জন্য যতটুকু জলের আবশ্যক সেই পরিমাণ জল দেওয়া হয়। সব জল ভাতেতেই থেকে যায় ও ভাত পরস্পরের গায়ে আঠার মত লেগে থাকে, সে জন্য কাঠি দিয়া তোলা সহজ। এইরূপে প্রস্তুত ভাত আমাদের ভাত অপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর। ভাতের মাড়ের সঙ্গে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ বাহির হয়ে যায়।

চাকরাণী খাবার সময় টেবিলের ধারে ভাতের একটি কেটো নিয়ে বসে থাকে। ভাত ফুরুলে একটি "ট্রে"র উপর খালি বাটিগুলি সংগ্রহ করে আবার ভরে দ্যায়। তিন বেলা জাপানীরা ভাত খায়, এ হিসাবে এরা অনেক বাঙালির চেয়েও 'ভেতো'। তবে 'ভেতো' জাপানী সকল বিষয়েই যে উন্নতি করেচে ও যা বিক্রম দেখিয়েচে তা দেখে কোনো 'ভেতো'রই লজ্জিত হবার কারণ নাই।

ভাতের পর মাংস ও মৎস্যাদি আসিল। জাপানীরা মৎস্য ও ডিম্বের খুব পক্ষপাতী। শাক সবজির মধ্যে মূলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেয়ে থাকে। ধনী, নির্ধন সকলেই খান; প্রাতে, মধ্যাহ্নে, ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই মজুত। যদি মনে ভাবেন টাট্‌কা মূলা খান ও রন্ধন করে খান, তা হলে ভুল বুঝ্‌লেন। ওর কোনটাই নয়; এঁরা পচা মূলা খান। এটি এঁদের চাট্‌নি, না হলে নয়। একটু অবস্থাপন্ন লোকে চাট্‌নির মত মূলা অল্পস্বল্প খান, কিন্তু গরীব লোকের ইহাই প্রধান তরকারি। অথচ মূলোখেকো মজুরদের চেহারা ভীমসেনের পকেট এডিসনের মত!

আহারাদির পর নীচেকার বারান্দায় গিয়া সকলে বস্‌লুম। দিনটি বেশ পরিষ্কার ছিল ; বারান্দার উপর শীতের অপ্রখর রৌদ্র আমাদের গায়ে এসে পড়্‌ল। বারান্দার নীচে অনতিবৃহৎ উদ্যান। এটি প্রত্যেক

পুষ্প বিক্রেত্রী।

জাপানী বাটীরই একটি প্রধান অঙ্গ। উদ্যানে অনেকগুলি "বামন" গাছ। এ গাছগুলিকে উচ্চে বাড়্‌তে দেওয়া হয় না, সে জন্য দুই

পার্শ্বে ডাল পালা বিস্তার করে অনেকটা কদম্ব-ফুলের আকার ধারণ করে। মধ্যে মধ্যে কাঁচি দিয়া গাছের মাথা ছেঁটে দেওয়া হয়। এরূপ গাছ দেখ্‌তে অতি সুন্দর; জাপানের বিশেষত্ব। ফুলের গাছ বিরল, বিশেষতঃ সুগন্ধী ফুলের। এখানে অতি সামান্য ফুলেরও কত আদর, কত যত্ন। প্রত্যেক ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফুটে। তখন ফুলের মেলা বসে যায়, সকলেই ফুল দেখ্‌তে ছোটে। আমাদের দেশে কত যুঁই-বেলি-মল্লিকা, গোলাপ-চামেলী-রজনীগন্ধা, পলাস-চাঁপা-টগর-গন্ধরাজের ছড়াছড়ি; বন, উপবন, গৃহপ্রাঙ্গণ ফুলের গন্ধে মুখরিত। তারা কিন্তু হায় গোপনে প্রস্ফুটিত হয়ে অবহেলায় মরে যায়, কে তার খোঁজ রাখে?

বাগানটা সমতল নয়। কোন জায়গা পাহাড়ের মত উঁচু; কোথাও বা উপত্যকার মত নীচু। মাঝে ঝির্ ঝির্ করে একটা ছোট প্রস্রবণ বয়ে যাচ্চে। অতি দরিদ্র লোকেও বাটীতে অল্প একটু জায়গায় বাগান তৈয়ারি করে। দু চারটে গাছ, কয়েকটা বন্য ফুল, ইহাই বাগানের সম্পত্তি। দীন সম্পত্তি হলেও অতি আদর যত্নে রক্ষিত হয়।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যখন বিদায় চাইলুম তখন সকলে দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। এখানে বিদায়ের সময় বল্‌তে হয় "সায়োনারা।" ইহার প্রকৃত অর্থ "যদি তাই হয়—।" এই অসম্পূর্ণতাই এ কথাটিকে এত মধুর করেচে। আমাদের কথায় "তবে আসি" না ব'লে কেবল যদি "তবে" ব'লে থেমে যাওয়া যায় তা হলে যেমন হয়। গৃহস্থের পক্ষ হতে এর উত্তরটা আরও মধুর, তাঁরা বল্‌বেন "মাতা ইরাষ্যাই,"—"আবার এস।" যখনি কারও বাটী গিয়ে বিদায় চাইবেন তখনি তাঁরা

বল্‌বেন "আবার এস।" জাপানী ভাষায় এ কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট ব'লে বোধ হয়। বিচ্ছেদের সময়ে মনে করিয়ে দেয় "আমরা তোমাকে মনে রাথ্‌ব, তোমার যখন ইচ্ছা এস। আমাদের দুয়ার তোমার জন্য সর্ব্বদাই খোলা থাকবে।" জাপান অতিথিবাৎসল্য হেতু প্রসিদ্ধ, এই দুটি কথা তা সপ্রমাণ করে। বিশেষতঃ প্রিয়জনের মুখে বিদায়কালে এরূপ সম্ভাষণ শুন্‌তে কার না ইচ্ছা হয়?

বিদেশে এসে এই প্রথম বিদেশীর বাটীতে গমন। এরূপ সুখ, এরূপ আদর যত্ন দেশে থাকতেও কখন পাই নি। কত সহস্র ক্রোশ ব্যাপী মহাসমুদ্র পারে বিদেশে এসে আজ প্রথম হৃদয় কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভ'রে গেল। বুঝ্‌তে পারলুম দক্ষিণ বা উত্তরে, পশ্চিম বা পূর্ব্বে, নিকটে দূরে, মানুষের অন্তঃকরণ বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্রই একরূপ। ভাষা ভিন্ন, জাতি ভিন্ন হলে কি হয়; স্নেহ, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল দেশে সকল জাতিতে বর্ত্তমান।

পারিবারিক জীবনে, স্ত্রীর প্রতি মনোভাব অনুসারে জাপানী স্বামী-দিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম, যারা নামে এবং কার্য্যে পরিবারের কর্ত্তা। ইহাদের মতে পরিবারের শাসন ভার সমস্তই তাদের হাতে; এবং এরাই পরিবার সংক্রান্ত যা কিছু সকলেরই মাথায়; অবশিষ্ট লোকেরা এদের করচালিত যন্ত্রবিশেষ। এরা ভদ্র হতে পারে; কিন্তু পরিবারের কেহই এদের চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে না। কর্ত্তার মনোভাব যে কি, তা তাঁর স্ত্রীও বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। স্ত্রীটি তাঁর প্রভুকর্ত্তৃক যা করতে আদিষ্ট হন ক্রীতদাসীর মত তাই করেন। তাঁকে হুকুম মেনে চল্‌তে হবে; কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবার অধিকার

স্ত্রীর নাই। এই প্রকার স্বামীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারী বিশেষ; ইংরাজিতে যাকে বলে "টাইর‍্যাণ্ট্।"

আর একদল পুরুষ আছেন, যাঁরা অপেক্ষাকৃত দয়ালু ও খোলা-মেজাজের লোক। এইরূপ লোকের বাটীতে সকলের মধ্যে কতকটা সমতা পরিলক্ষিত হয়, এবং কখন কখন স্ত্রীকে স্বামীর উপর আধিপত্য করতে দেখা যায়। যে সব স্ত্রীলোক নিজ উপার্জ্জিত অর্থে স্বামীকে প্রতিপালন করেন, সাধারণত তাঁরা স্বামীর উপর আধিপত্য করেন। কেশবিন্যাসকারিণী স্ত্রীলোকের স্বামী প্রায়ই অলস, স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থে জীবন ধারণ করে।

পুরুষের বয়স অন্যূন সতের এবং স্ত্রীলোকের পনের হলে তবেই বিবাহ হতে পরে। ইহাই আইন। তবে সাধারণত মেয়েদের ১৮-১৯ বৎসরের আগে বিবাহ হয় না, কারণ ঐ বয়সে তাহাদের ইস্কুলের পড়া শেষ হয়। পুরুষ সাধারণত ২৪-২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করে। অধিকাংশ মেয়েদের একুশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়ে যায়; তদূর্দ্ধে যে হয় না এমন কথা নয়, তবে এরূপ মেয়ের সংখ্যা কম।

একই লোকের একই সময়ে দুইটি বিবাহ করা আইনে নিষিদ্ধ; তবে ডিভোর্স্ বা স্বামী স্ত্রীতে পৃথক্ হওয়া প্রচলিত আছে। কিন্তু ভদ্র সংসারে প্রায়ই তাহা হয় না। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বড় শিথিল ব'লে বোধ হয়, ও স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই পৃথক হয়ে, নূতন স্বামী বা নূতন স্ত্রী গ্রহণ পরিদৃষ্ট হয়। জাপানী স্বামী, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে একথা খাটে না। ইহাও পুরুষের স্ত্রীলোকের উপর অন্যায় অত্যাচার, ও ঘোর স্বার্থপরতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবাহিত লোকেরা নিজেদের মধ্যে পৃথক্‌ হওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারে, কোন কোন স্থলে অভিভাবকদের অনুমতি প্রয়োজন। ইহা বিচারালয়ের অনুমতি সাপেক্ষ নয়। পৃথক হয়েছি ব'লে রেজিষ্টারি করালেই হ'ল। অনেকস্থলে বাপ মা পুত্রবধূকে পছন্দ করেন না ব'লে পুত্রকে স্বইচ্ছার বিরুদ্ধে বধূকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন, ও ছেলের নূতন বিবাহ দেন। আমাদের সমাজেও এরূপ ঘটনা বিরল নয়।

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও কন্যায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। পিতা মাতা বা অভিভাবকেরাই সব স্থির করেন। প্রথাটি আমাদের দেশের মত হলেও অধিকতর ক্রূর ব'লে বোধ হয়; কারণ আমাদের দেশে, মেয়ে যখন নিতান্ত শিশু, বিবাহ কি তাই জানে না, তখনই তার বিবাহ হয়; এবং বয়স্থা হলে ক্রমে সে স্বামীকে ভক্তি করতে শিখে ও তাহার পরিচর্য্যা করে। সকলেই যে দাম্পত্য জীবনে সুখী এরূপ বোধ হয় না। অনেকে বিষম দুঃখের বোঝা হৃদয়ে ধারণ করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, গৃহাভ্যন্তরে "বাট্‌না বেটে" ও "কুট্‌নো কুটে" অবশেষে মৃত্যুতে বিলীন হয়ে যায়। এখানে কিন্তু মেয়েকে সুশিক্ষা দেওয়া হয়, তারা ঘরের ভিতর বন্ধ থাকে না, বহির্জগৎ অনেকটা দেখতে পায় এবং অনেক সময় কাকেও বা প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু পিতা মাতার স্বার্থপরতা সন্তানের সুখের পথে কণ্টক হয়, এবং পিতা মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে তাঁদের মনে বেদনা দেওয়া শিশুকাল থেকে পিতা মাতার আজ্ঞা পালনে শিক্ষিতা জাপ [illegible] পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। তাই যখন সে দেখে পিতা মাতা এক অজানিত লোকের সঙ্গে তার বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন; বেঁচে থাকলে তার দেহ বিক্রয় ছাড়া গত্যন্তর নাই; তখন

প্রিয়তমের সঙ্গে সে চিরমিলনে চলে যায়। উভয়ের দেহ দৃঢ়ভাবে রজ্জুবদ্ধ করে উদ্দাম সাগরে ঝাঁপ দেয়; কখনও বা গভীর খাতে লম্ফ-প্রদান করে প্রাণত্যাগ করে; আর কখনও বা গতিশীল ট্রেনের সাম্‌নে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্ত্তে প্রেমের স্বর্গলাভ করে! ইহাই "ষিঞ্জু" বা সহমরণ। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে এরূপ খবর পড়া যায়।

পাঠক পাঠিকার নিকট এ মরণ ভয়াবহ বোধ হলেও প্রেমিক প্রেমিকার নিকট এ বড় সাধের মরণ, সুন্দর মরণ। যাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসা যায়, তাকে লাভ করবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন বড় সহজ। প্রেমিক প্রেমিকার এই ভীষণ-সুন্দর আত্মবিসর্জ্জনে প্রেম চরিতার্থতা লাভ করে; এবং যদিও খবরের কাগজে কিঞ্চিত উল্লেখ ছাড়া আর কেহই এ আত্মবিসর্জ্জনের কোন সংবাদ নেন না তাতে প্রেমের কি আসে যায়? ঈপ্সিতের প্রেম লাভই প্রেমিকের চরম পুবস্কার, সাধারণের নিন্দা স্তুতিতে তার যায় আসে কি!

জাপানী স্ত্রী পুরুষ যত সহজে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে, তা দেখে বোধ হয় ভারতবর্ষ বেদান্তের জন্মভূমি হলেও, এরাই আত্মার অবিনশ্বরতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পেরেচে।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গেলে কন্যা তাঁর ভাবী স্বামীকে একছত্র পরিচ্ছদ পাঠিয়ে দেন, এবং বর তাঁর ভাবী স্ত্রীকে একটি "ওবি" উপহার দেন, এবং তার সঙ্গে মৎস্য, মদ্য প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

আমাদের দেশে বর কন্যার বাটীতে বিবাহ করিতে যান, এখানে কন্যা বরের বাটীতে যান। বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে, সাধারণত বিবাহের

দিন প্রাতে, কন্যা বড় বড় কাঠের সিন্দুকে তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ও গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও কিছু টাকা বরের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। যারা দ্রব্যাদি বয়ে নিয়ে যায় তারাও বেশ দু পয়সা পায়।

কন্যার সাজগোজ কর্‌তে অনেক সময় যায়। চুল বাঁধ্‌তে হবে, মুখে ও গ্রীবাদেশে পাউডার দিতে হবে, অনেক কাজ। সে দিন কন্যা শ্বেত রেশমী পোষাক পরেন ও তার উপর রেশমী ক্রেপের আবরণ দেওয়া হয়। বর সাধারণ জাপানী ভদ্রলোকের পোষাকে সজ্জিত হয়ে নিজ বাটীতে কন্যার প্রতীক্ষা করেন।

আসল কাজটি কিন্তু খুব সহজ। যে ঘরে বিবাহ হয় সেটি বংশ, দেবদারুর ডাল, ও কুলের ফুলে সজ্জিত হয়; এই তিনটি বস্তু দাম্পত্য সুখের মাঙ্গলিক চিহ্ন।

ঘরে প্রবেশ কর্‌বার আগে কন্যা তাঁর মুখ পাৎলা কাপড়ে আচ্ছাদিত করেন। সে ঘরে বড় জোর বার জন প্রবেশ করবার বিধি। বর ও তাহার পিতা মাতা, কন্যা ও তাঁর পিতা মাতা, দুই ঘটক তাদের স্ত্রী ও পাত্রবাহক দুটি ছোট ছোট ছেলে।

বর ও কন্যা মুখোমুখি করে বসেন। তাদের মাঝখানে একটি ছোট শ্বেত রঙের কাঠের টেবিল, উচ্চে আঠার ইঞ্চি, ও উপরিভাগ সম-চতুষ্কোণ, প্রত্যেক ধার এক ফুট। টেবিলের উপর লাল ল্যাকারের "সাকে"র পেয়ালা।

বিবাহের সময় কোন কথাই নেই; মন্ত্র উচ্চারিত হয় না, প্রতিজ্ঞা নেই, উপাসনাও নেই। বর এবং কন্যা এই তিনটি পেয়ালাতে তিন তিন বার সাকে পান করেন। বিবাহ হয়ে গেল। তারপর নবদম্পতী তাঁদের

বিবাহ।

পিতামাতাকে "সাকে" প্রদান করেন। তারপর সাধারণ বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দেওয়া হয়।

এক সময়ে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের দন্ত কালো রঙে রঞ্জিত করবার জঘন্য বিধি প্রচলিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে কৃষ্ণদন্তবিশিষ্টা বৃদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয়।

বিখ্যাত জাপানী ভাষাবিৎ অধ্যাপক চেম্বারলেন জাপানী কুস্তিগির-দিগকে "চর্ব্বি ও মাংসের পাহাড়" এই আখ্যা প্রদান করেচেন। আখ্যাটি যথার্থ হয়েচে। সাধারণ জাপানী ও কুস্তিগির জাপানীতে অনেকটা মশা ও হাতির সম্বন্ধ। সাধারণ জাপানীটি দেহের খর্ব্বতাহেতু যেন ভূমিতে লুটাইতে যাচ্চেন ব'লে বোধ হয়, আর কুস্তিগির জাপানী
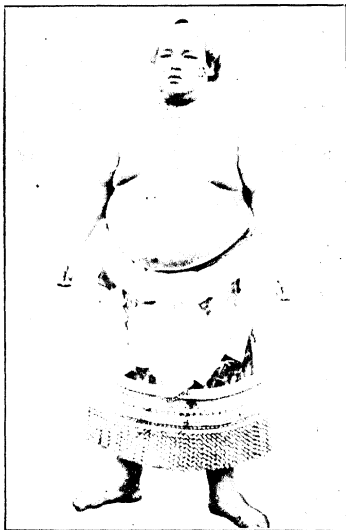
পালোয়ান।

দেহের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একটা বিরাট পাহাড়ের মত। ইহাদের শরীর দেখে মনে হয় দেহের গুরুত্ব হেতু এরা ক্ষিপ্র হতেই পারে না, কিন্তু যাঁরা জাপানী কুস্তি দেখেছেন তাঁরা অন্য প্রকার বল্‌বেন।

এ সব লোকের কুস্তিই ব্যবসায়। এদের মধ্যে নানা আকারের লোক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতমেরা সাধারণত দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চির অধিক

নয়। বৃহত্তমেরা ৬ ফুটেরও উর্দ্ধে, প্রায়ই ৬ ফুট ৩-৪ ইঞ্চ্। ইহাদের কুস্তি আমাদের কুস্তি বা য়ুরোপীয় কুস্তি হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জাপানী কুস্তিতে ৪৮ রকম পতন, ২২ রকম নিক্ষেপ, ১২ রকম আকুঞ্চন, ১২টি উত্থান, ও পিঠের উপর দিয়া ১২ রকম নিক্ষেপ আছে। ঠিক রকম পতন হলে পতিতের হার হয়, কিন্তু ভাল ভাল পালোয়ানদের প্রায়ই এরূপ ঘটে না। বৃত্তাকার একটা গোল দাগ টানা হয়, এবং তার মধ্যে কুস্তি হয়। যে কেহ অপরকে ধাক্কা দিয়ে বা বহন করে এই বৃত্তের বাহির করে দিবে তারই জয়। শরীরের অল্প কোন অংশ বাহির করতে পারলেই হ'ল। ইহাতে বুঝা যাবে দৈহিক ওজন যার যত বেশী তারই তত জয়ের সম্ভাবনা। অবশ্য অন্যান্য গুণও থাকা দরকার ; যথা ক্ষিপ্রতা, ধৈর্য্য, দম প্রভৃতি।

এ সব কুস্তিতে যিনি বিচারকর্ত্তা তাঁর একটি পাকা লোক হওয়া দরকার। বিচার যাতে নির্ভুল হয় ইহাই তাঁকে দেখ্‌তে হবে। পূরাকালে এঁরনিকট একখানি তরবারি থাক্‌ত ; যদি কখন ভুল বিচার করতেন তা হলে স্বহস্তে তরবারি দিয়া পেট কাটিয়া ভুলজনিত পাপক্ষয় করতেন। সুখের বিষয় আজকাল এ লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা উঠে গেছে।

তরবারির পরিবর্ত্তে আজকাল বিচারকর্ত্তার হাতে একখানি পাখা থাকে। কুস্তির সময় তিনি সর্ব্বদা অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করেন, কেন তা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। বিচারকর্ত্তার পোষাক সাধারণ নয়, এখনও পুরাতন পোষাক ব্যবহৃত হয়। কুস্তির মঞ্চের চারি কোণে চার জন দীর্ঘকায় লোক বসে থাকেন। কোন কুস্তির ফলাফল ভাল বোঝা

কুস্তি।

না গেলে, এ চার জনার সাহায্য গৃহীত হয়। সকলে মিলে উভয় পক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে একটা মীমাংসা করে ফেলেন। কুস্তি আরম্ভ হবার আগে বিচারকর্ত্তা মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হয়ে পালোয়ান দু জনের নাম অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করে ডাকেন। বিচারাসনে উপবিষ্ট লোকের স্বল্পবাচী ও গম্ভীর হওয়া দরকার।

কুস্তির আখড়ার কর্তৃপক্ষীয়েরা হৃষ্টপুষ্ট বালকের সন্ধানে থাকেন, এবং কুস্তিগিরদের ব্যবসায়তে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জনের সুবিধা থাকাতে এরূপ বালকের অভিভাবকেরা খুব আহ্লাদের সহিত বালককে কুস্তির আখড়ায় ভর্ত্তি করে দেন।

জাপানী পালোয়ান ও ভারতীয় পালোয়ান ইহাদের মধ্যে কে অধিক

বলশালী তা বলা কঠিন, যেহেতু উভয়ের কুস্তি করবার কায়দা বিভিন্ন। তবে জাপানী পালোয়ান যে প্রভূত বলশালী তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে।

একবার জাপানী বিখ্যাত পলোয়ান তাইহো'কোন বিদেশীয়ের সহিত বাক্যালাপের সময় বলেন কেহ তাহার পেটের উপর লাথি মারিয়া বাধিত করিবে কি? জনৈক আমেরিক্যান যুবক স্বীকৃত হলে পালোয়ানজি তাহার বিরাট পদদ্বয়ের উপর জোর করে দাঁড়ালেন। আমেরিক্যান যুবকটি কিছু দুর পিছাইয়া গিয়া, ছুটে এসে লম্ফপ্রদান করে সবুট পেটে লাথি বসাইলেন। বুটের তলায় কাঁটা দেওয়া ছিল। জাপানী বীর সাম্‌নের দিকে একটু ঝাঁকা দিলেন, আর বিদেশীয় যুবক কয়েকপদ পশ্চাতে ......পপাত ধরণীতলে! এই পালোয়ান ১৮০ পাউণ্ড্ ওজনের বিদেশীয়কে হস্ত দ্বারা ওয়েষ্টকোট ধৃত করে, হাত না বাঁকাইয়া জমি হতে শূন্যে উঠাইতে পারতেন!

কুস্তি দেখ্‌তে বিপুল লোক সমাগম হয়। পুরুষই বেশী। তোকিওতে কুস্তির যে প্রকাণ্ড দালান আছে, তাতে প্রায় দশ হাজার দর্শক বসিতে পারে।

কুস্তির সময় যে পালোয়ানের জয় হয়, তাঁর পক্ষাবলম্বী দর্শকেরা আনন্দে অধীর হয়ে ছাতা, লাঠি, টুপি, খাবারের বাক্স, এবং কখন কখন কাষ্ঠ পাদুকা প্রভৃতি ক্রীড়াভূমির মধ্যে নিক্ষেপ করেন। সে গুলি আবার তথাকার কর্তৃপক্ষীয়েরা যত্ন পূর্ব্বক উঠিয়ে রাখেন। পর দিন এই সকল দ্রব্যের মালিকেরা এসে তাঁদের দ্রব্যাদি নিয়ে যান, ও তৎপরিবর্ত্তে যথা সাধ্য কুস্তির আড্ডায় মুদ্রা পুরস্কার করেন।

আমাদের দেশের মত এদেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ না থাক্‌লেও যে কয়টি আছে সে গুলি অর্থবিরহিত নয়। পার্ব্বণগুলি ব্যতীত বসন্তের "সাকুরা" ও শরতের "কিকু"র সময় সকলেই উৎসব তরঙ্গে ভেসে যায়, প্রাণ খুলে আমোদ করে, মেয়েরাও ঐ আনন্দ যথেষ্ট উপভোগ করে।

নববর্ষের প্রভাতের সহিত, ১লা জানুয়ারি বৎসরের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উৎসব আরম্ভ। তখন প্রবল শীত, অনেক সময় বরফপাতে

"বরফপাতে বাহিরে পদার্পণ করা কষ্ট সাধ্য হয়।"

বাহিরে পদার্পণ করা কষ্ট সাধ্য হয়; কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে প্রবাহিত আনন্দের স্রোতঃ ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বৎসরের প্রথম তিন দিন উৎসব চলে; এ ক'দিন জাপানী গৃহস্থ বড়ই ব্যস্ত, সকলেই রিক্‌স চড়িয়া বা পদব্রজে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় পরিজনের বাটীতে গিয়া নববর্ষের

অভিনন্দন করে আসেন। এ সময়ে জাপানী বাটীতে "ওতোসো"—এক প্রকার সুবাসিত ও সুমিষ্ট মদ্য—অভ্যাগতকে পান করতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বাটীতেই এইরূপ ; সে জন্য বন্ধুর সংখ্যা যাঁদের বেশী তাঁরা একটু অতিরিক্ত পান করে ফেলেন। যাক্, সেটা মার্জ্জনীয়। এ সময়ে স্ত্রী পুরুষ সকলেই পান করেন ; ঐ সুরা বড় মৃদু ও বেশ সুস্বাদ। ইহা তণ্ডুল হতে তৈয়ারি ও "তোসো" নামক চীনা মসল্লার দ্বারা সুগন্ধীকৃত। ঐ মসল্লা একটি ত্রিকোণ রেশমের থলিতে পূরিয়া, রেশমের সুতা দিয়া মদ্যভাণ্ডের ভিতর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

একটি "ট্রে"র উপর তিনটি লাল ল্যাকারের চেপ্টা পেয়ালা উপরি উপরি রাখিয়া অভ্যাগতকে দেওয়া হয়। আদব কায়দা অনুসারে প্রত্যেক পেয়ালা থেকে পান করতে হয়। আপনার পান সমাপন হলে, সেই পাত্র ঘুরাইয়া দিয়া অভ্যর্থনাকারীদের মদ ঢালিয়া দিবেন, ইহাই রীতি। পেয়ালাগুলির গাত্রে ছোট একটি দেবদারু পাতা শ্বেত ও লোহিত কাগজের সুতায় বাঁধা থাকে।

এই স্থানে বলা উচিত, নববর্ষের তিনটি মাঙ্গলিক চিহ্ন ; কুলের ফুল, দেবদারু গাছ, ও বাঁশ। কুলের ফুল,—বৎসরের প্রথম ফুল ; তুষার ও ঘোর শীতের মধ্যেও প্রস্ফুটিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। গূঢ়ার্থ :—তুমি যেন দুঃখ, কষ্ট, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে থেকে উন্নতি লাভ করতে পার !

দেবদারু গাছ সর্ব্বদাই সবুজ। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, সকল সময়েই সমান। গূঢ়ার্থ :—তুমি যেন চিরকাল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ কর ! বংশ সোজা হয়ে ওঠে, কথনো বেঁকে যায় না। গূঢ়ার্থ :—তুমি যেন এই-

রূপই সোজা হয়ে উঠ্‌তে পার, দুঃখ, কষ্ট, প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যেন মুশ্‌ড়ে না যাও!

দোকান পসার, ও সকল বাটীর সাম্‌নে দেবদারুপাতা ও বংশখণ্ড স্থাপিত হয়, অনেক স্থলে দেবদারুপাতার গায়ে একটি কমলা লেবু ও "গল্‌দা" চিংড়িমাছ সংলগ্ন থাকে। এ গুলি বৎসরের সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত থাকে, তৎপরে উঠিয়ে ফেলা হয়।

নববর্ষের দিন, ১লা জানুয়ারি, ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া হয় না; পাছে নববর্ষের ভাগ্যদেবতা সম্মার্জ্জনীর তাড়নে গৃহস্থকে পরিত্যাগ করে যান! সে জন্য পূর্ব্ব রাত্রে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটী ঝাড়াঝুড়ো, পরিষ্কার করা হয়। পুরাতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আবর্জ্জনা ও ময়লা দূর করে দেওয়া হয়।

নববর্ষের সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার প্রথা প্রচলিত আছে, সে জন্য ঐ দিন জাপানীরা খুব ভোরে উঠেন, কোন একটা উচ্চ স্থানে সমবেত হয়ে, নববর্ষের প্রারম্ভে, তাপ ও আলোকের উৎপত্তি স্থান তপনের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য প্রতীক্ষা করেন। নববর্ষের সূর্য্যোদয় দেখ্‌লে নাকি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়!

যাদের কোন বিপদের আশঙ্কা আছে,—এবং তাদের সংখ্যাও অল্প নয়—ঐদিন ভোরের বেলা সাত প্রকার ভাগ্যমন্দিরের কোন একটিতে গিয়া খুব পূজা করেন। সকলেই সে দিন নূতন পোষাকে সজ্জিত হন, এমন কি ভারবাহী ঘোড়া ও বলদকেও নূতন সাজে ও নানা রকম রঙিন কাপড়ের ফিতা ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

জাপানী বাটীতে গিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি ব'লে নববর্ষের অভিনন্দন

করতে হয়। "নববর্ষের উন্মেষে আপনাকে অভিনন্দন করচি। গতবর্ষে আপনার নিকট অনেক অনুগ্রহ পেয়েছি, তজ্জন্য ধন্যবাদ; আশা করি এ বর্ষেও তার অন্যথা হবে না।"

২রা তারিখে নামে মাত্র কাজ হয়। ব্যবসায়ীরা বৎসরের প্রথমে মাল সুসজ্জিত গাড়ীতে সরবরাহ করে। ছুতার তার যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে; জেলে তার মৎস্য ধরবার জাল দেখে; সৈনিক তরবারি হাতে করে নেয়, আর পুস্তকবিক্রেতা নববর্ষের পুস্তকগুলি উল্‌টে পাল্‌টে দেখে।

৩রাও ছুটি, আপিষাদি বন্ধ থাকে। খুব বিলম্ব হলে ৭ই তারিখ পর্য্যন্ত অভিনন্দন করতে যাওয়া যায়। ঐ দিন নববর্ষ-উৎসবের শেষ। সেই দিন সাতরকম শাকে প্রস্তুত সূপ খাওয়া হয়।

নববর্ষের খেলার মধ্যে "হানে", বা ইংরাজিতে যাকে Battledore and Shuttlecock বলে, তাহাই সর্ব্বপ্রধান। দুজনে দুখানা কাঠের ছোট ছোট ব্যাট্ নিয়ে একটা পালক সংযুক্ত হাল্‌কা গুলিতে আঘাত করে মাটিতে পড়্‌তে না দেওয়াই হ'ল খেলা। যার দিকে পালক পড়ে যায়, তার হার; এবং যে হেরে যায় তার পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ মুখে খানিকটে সাদা রং লাগিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এ খেলা খেলেন, স্ত্রীলোকেরাই বেশী! বৎসরের প্রথম তিন দিন বাটীর বাহির হলেই, প্রত্যেক জাপানী বাটীর সাম্‌নে রাস্তায় সকলে খেল্‌চে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ছোট ছোট ছেলেরা অনেকে একটা মুক্ত স্থানে গিয়ে ঘুড়ী উড়োয়। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে সকলে মিলে নানা রকম খেলা করেন।

মাথায় খড়ের টুপি দিয়ে সামিসেনের সহিত "গেইষা"রা দ্বারে দ্বারে মঙ্গল গীত গেয়ে বেড়ায়।

নববর্ষের গায়িকা।

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন, বা ৩রা মার্চ্চ, "ও হিনা মাৎসুরি" নামক ছোট ছোট মেয়েদের পর্ব্বদিন। এ দিন ছোট মেয়েরাই কর্ত্রী; তারা তাদের ছোট ছোট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে, ও স্বহস্তে ছোট ছোট বাটি,

থালী প্রভৃতিতে খাদ্য দ্রব্য সজ্জিত করে নিমন্ত্রিতকে খাওয়ায়। "ষিরোসাকে," একপ্রকার শ্বেত মিষ্ট মদ সকলকে দেওয়া হয়। একটি ঘরে উৎসবের দেবতা "ও হিনাসান" ও তাঁর চতুর্দ্দিকে পুতুল সজ্জিত করে রাখা হয়। কয়েকটি ধাপের উপর পুতুলগুলি সজ্জিত থাকে; সর্ব্বোচ্চ ধাপে একটি পুরুষ ও রমণী পুতুলকে রাজ পরিচ্ছদে সজ্জিত করে রাখা হয়। ইহারা হলেন সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী, মেয়েদের পুতুল খেলাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

মেয়ের জন্মের পর প্রথম ৩রা মার্চ্চ্ তাকে পুতুল কিনে দেওয়া হয়। এই পুতুলগুলি প্রতিবৎসর ব্যবহৃত হয়। বেচারা পুতুলেরা একবৎসর ঘাঁটাঘাঁটির পর এই একদিন একটু বিশ্রাম করতে পায়। বৎসর বৎসর এই উৎসবের মধ্য দিয়া মেয়েরা বাল্যকাল হতে গৃহিণীপণার কার্য্যে সুশিক্ষিতা হয়ে উঠে।

মেয়েদের পার্ব্বণের মত বালকদের ও একটি পার্ব্বণ আছে। এটি প্রতিবৎসর পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে, বা ৫ই মে তারিখে হয়। এ উৎসবের নাম "তাংগো নো সেক্কু" বা "মিষ্টপতাকা উৎসব।" পুতুলের পরিবর্ত্তে পুরাকালের বীর পুরুষদের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি; এবং যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম, তরবারি, বর্ম্ম, প্রভৃতি একটি ঘরে সাজাইয়া রাখা হয়। এদিনও ছেলেরা তাদের ছোট ছোট বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করে আহারাদি করায়। এ পার্ব্বণের দিন কোন রকম মদ্য থাকে না। এ দিন, যেমন "ও হিনা মাৎসুরি"র দিন, শিশুদের মাতা, পিতা ও অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা ছেলেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে উৎসবে যোগ দান করে আমোদ আহ্লাদ করেন।

বালকদের উৎসবের দিন বাটীর উপর লম্বা বাঁশের আগায় নানা আকারের ও নানা রঙের কাগজের মৎস্য উড়্‌তে দেখা যায়। মাছের উন্মুক্ত মুখের মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মাছটিকে উড়িয়ে রাখে। এই উৎসব, অন্যান্য অনেক জিনিষের মত চীন হতে আমদানী হয়েছিল। এই মৎস্য সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ; সর্ব্বদা সে স্রোতের মুখে জলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌চে। তেমনি বালকেরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে, শত বাধা বিঘ্ন ও বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে সাহসের সহিত যুদ্ধ করে যেন জয়লাভ কর্‌তে পারে! বাল্যকাল হতে ছোট ছোট ছেলেদের বীর পূজায় দীক্ষিত করে তাদের মনে বীরভাব জাগিয়ে তোলাই এ উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাপান তার রণপাণ্ডিত্যে জগতে প্রচারিত হবার বহুপূর্ব্বে এ দেশের "গেইষা" বা নর্ত্তকীদের কথা সভ্য জগতে প্রচারিত হয়েছিল। য়ুরোপ ও আমেরিকা জাপান সম্বন্ধে অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত না হলেও, "গেইষা"র কীর্ত্তিকলাপ তাঁদের কর্ণে পঁহুছিয়াছিল। এমন কি আজকাল পাশ্চাত্য পর্য্যটকদের কাছে ইহাও একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েচে। এই হিসাবে "গেইষা"কে স্বদেশ-প্রেমিকা বলা যেতে পারে, কেননা এরা জগতে স্বদেশের নাম প্রচারিত করতে অনেকটা সহায়তা করেচে। কয়েক শতাব্দী হতে, এমন কি বিখ্যাত য়োরিতোমো ও য়োষিৎসুনের সময় হতে এরা বিদ্যমান।

এরা অতিশয় কোমল-স্বভাবা ও একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, হাবভাব মাধুর্য্যমণ্ডিত। এই ব্যবসায় শিক্ষা করতে বহুবৎসর কাটাতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, সঙ্গীত ও লিখনপ্রণালী শিখ্‌তে হয়। আদবকায়দাদুরস্ত, ব্যঙ্গ-পরিহাস-নিপুণা, ও

মধুরভাষিণী হতে হবে। ইহার উপর আবার যিনি যত সুন্দরী ও সুকণ্ঠী তাঁহার খ্যাতিও তত অধিক।

সাধারণত দশ বার বৎসর বয়স হতেই ইহাদের শিক্ষা আরম্ভ হয়। অন্তত জাপানের দুই বিখ্যাত যন্ত্র "সামিসেন" ও "কোতো" বাজাতে শিখ্‌তে হয়। কবিতা আবৃত্তি ও লিখনপ্রণালীও শিক্ষার অন্তর্গত। লিখনপ্রণালী বল্‌তে কেবল ভাল হস্তলিখন বুঝায় না, পরন্তু রচনায় পারদর্শিতাও বুঝায়। কথোপকথন করবার সময় সমস্বরে, অনুচ্চস্বরে, ও মুখের ভাব বিকৃত না করে কথা কইতে হবে। সমস্বভাবা হতে হবে; কখন ভাল মেজাজ কখন খিট্‌খিটে মেজাজ হলে চল্‌বেনা। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি কর্‌লে চল্‌বেনা। পোষাক পরিচ্ছদ বা কেশবিন্যাসে কোন অংশে অত্যধিক দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, সমস্ত শরীরে একটা সামঞ্জস্য যাতে রক্ষিত হয় তাই কর্‌তে হবে; সকল বিষয়েই লোকের প্রশংসার্হ হবার উপযুক্ত হতে হয়।

ইহাদের মধ্যে পুরুষভাব সর্ব্বথা দুষণীয়, রমণীত্ব সর্ব্বাংশে বজায় থাকা চাই। চালচলনে একটা জড়সড় ভাব বা অপরিচ্ছন্নতা কেহই পছন্দ করেন না। প্রথম শ্রেণীর নর্ত্তকীরা স্বভাবতই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি নখের কোণগুলিতে পর্য্যন্ত কখন একটু ময়লা দেখ্‌তে পাবেন না। অহরহ সুমার্জ্জিত সমাজে চলাফেরা করে এদের ভাষা ও রুচি মার্জ্জিত হয়ে গেছে। ইহারা না থাক্‌লে কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না। এরা নৃত্য করে দর্শকগণের চিত্তবিনোদন করে। আহারাদির সময় পরিবেষণাদিও করে, ও সরস ব্যঙ্গ পরিহাসে সভা মুখরিত করে রাখে। উজ্জ্বল রঙিল রেশমী পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে

বহুজনে একত্র যখন নৃত্য করে, সে এক অপরূপ দৃশ্য! মনে হয় রঙ বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্চে!

নৃত্য কর্‌বার সময় জমিতে পা লেগেই থাকে, নিঃশব্দে সরে সরে বেড়ায়। নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে এরা নানা আকার ধারণ করে। কখন প্রজাপতির মত, কখন বা দুজনে হাত ধরাধরি করে সিংহরূপ ধারণ করে। কয়েকটি নৃত্য অতি বিচিত্র ও নয়নমোহন। নৃত্যের সময় একদল মেয়ে "সামিসেন" ও ডম্বরুর ঐক্যতান বাদন করে ও গান গায়। নৃত্যের পোষাক ভূমিতে লুটিয়ে যায় ব'লে নর্ত্তকীদের পা দেখা যায় না। সেইজন্য নৃত্যের সময়, এরা রঙিল মেঘের মত ভেসে বেড়াচ্চে ব'লে বোধ হয়।

জাপানের ধর্ম্ম কি? ইহা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তা হলে বল্‌তে হয় আমাদের দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম বল্‌তে যা বুঝায় এখানে সেরূপ কিছু নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রায় সকলেরই আছে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের। আজকালকার যুবকেরা অনেকে ক্রিষ্টিয়ান মতের অনুরাগী। এ অনুরাগ কিন্তু খৃষ্টের প্রতি অনুরাগবশত নয়। গোপনে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেহ বলেন ক্রিষ্টিয়ান না হলে সভ্য হওয়া যায় না। অনেকেই বলেন ইংরাজি ভাষা শিখবার আশায় ক্রিষ্টিয়ান হয়েচি। এই সব নব্য ক্রিষ্টিয়ান কোন ধর্ম্মেরই ধার ধারেন না; কিন্তু জাপানের যা সত্য ধর্ম্ম, স্বদেশপ্রীতি, পূর্ব্বপুরুষের পূজা ও ভক্তি, ও সম্রাট্ ও স্বদেশের প্রতি অদ্ভুত অনুরাগ; এগুলি সকল জাপানীরই নিজস্ব সম্পত্তি। যতই বিদেশ ঘেঁসা হউক না কেন, উপরিউক্ত ভাব বিরহিত জাপানী অতি বিরল; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হবে না। শুনেচি মান্দ্রাজের দিকে অনেক দরিদ্র লোক

অন্নাভাবে ক্রিষ্টিয়ান হতে বাধ্য হয়েচে। তাদের মধ্যে অনেক মুসলমান। তারা যথা সময়ে নেমাজ পড়ে ; কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "ক্রিষ্টিয়ান হয়ে আবার নেমাজ কেন ?" "তা হলে কি হয় ? ক্রিষ্টিয়ান হলেও

বৌদ্ধ-পুরোহিত।

আগে মুসলমান ত বটে ; আমরা মুসলমান-ক্রিষ্টিয়ান", এইপ্রকার উত্তর দেয়। যারা আগে হিন্দু ছিল তাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ-ক্রিষ্টিয়ান

বা কায়স্থ-ক্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দেয়! এই সব "ক্রিষ্টিয়ান" এর সংখ্যা জগৎসমক্ষে প্রচারিত করে খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতি লাভে য়ুরোপীয় ও আমেরিক্যান মিশনরিগণ গৌরব করে থাকেন।

গৌতম বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট বা কনাফউসিয়াস, ইহাঁদের সকলেরই উপাসক জাপানে আছেন; কিন্তু ষিস্তো ধর্ম্ম যা জাপানের রাজধর্ম্ম, প্রকৃতপক্ষে তাহাই প্রত্যেক জাপানী স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা তাদের দৈনিক জীবন ব্যাপৃত, ও চিন্তাশক্তি গঠিত। ইহাই জাপানের সম্মুখে অদ্ভুত স্বদেশপ্রীতির ধ্বজা তুলেচে। এক কথায় ইহাই জাপ-জাতির মেরুদণ্ড। য়ুরোপ, আমেরিকার দিকে চেয়ে দেখুন, ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর ও চাক্‌চিক্য থাকা সত্ত্বেও, তাহা প্রাণহীন—নির্জীব। তাহার সহিত মিলিয়ে দেখ্‌লে জাপানের প্রাচীন নির্জ্জন মন্দির সকল যেন জাপানে প্রকৃত ধার্ম্মিকের অভাব বিঘোষিত করচে। আর একটু তলিয়ে দেখুন, দেখ্‌বেন জাপানের নীরব পরিত্যক্ত দেবালয়ে বাহ্যাড়ম্বরের অভাব সত্য, কিন্তু ভিতরে জড়তার লেশমাত্র নাই, জাতির মধ্যে একটা প্রাণ আছে ও মনে শান্তি আছে। যার অনুভব কর্‌বার শক্তি আছে তার এ প্রাণ খুঁজে পেতে বিলম্ব হবে না।

"ষিস্তো ধর্ম্মের নিগূঢ় জীবনীশক্তি বল্‌তে এমন কিছু বুঝায়, যা পূজাচার ও জনশ্রুতি হতেও গভীর। ইহা দ্বারা উচ্চাঙ্গের চরিত্র বুঝায়,—সাহস, সৌজন্য, সম্মান এবং সর্ব্বোপরি অনুরাগ। ইহার বিশেষ গুণ হচ্চে সন্তানোচিত ধর্ম্ম বা মাতা পিতার প্রতি অনুরাগ, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আসক্তি, ও কারণানুসন্ধান না করেই কোন এক বিশেষ তত্ত্বের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন। ইহা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তা পৈতৃক নৈতিক

শক্তিতে পরিবর্ত্তিত, নীতিশাস্ত্রানুযায়ী প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত। ইহাই জাপানের প্রাণ।" *

অবশ্য বহুকাল অন্যান্য জাতি হতে পৃথক্ থাকার জন্য জাপানীরা স্বদেশপ্রেমিক ও সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অহরহ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে এরা স্বদেশকে যে ভালবাসতে শিখবে ও দেশের কথায় গৌরবান্বিত হবে, ইহাই স্বাভাবিক; অবশ্য ষিন্তোধর্ম্মের প্রভাব যে অনেকটা আছে তাতে সন্দেহ নাই। এ ধর্ম্মের প্রধান গুণ, এ সকলকে এক করে তোলে। কোনরূপ জাতিবিচার নাই, তন্ত্র মন্ত্রও নাই; ইহা স্বর্গগমনের আশাও দেয় না, নরকের বিভীষিকাও দেখায় না। ঠাকুর পূজাও নাই, পুরোহিতের অত্যাচারও নাই; এমন কি ধর্ম্মের কথা নিয়ে কোন তর্ক হবার সম্ভাবনা, ও পরে মনোমালিন্য হবার আশঙ্কা নাই। এ জন্য এদেশের ইতিহাসে ধর্ম্মের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডা, কলহ বা যুদ্ধাদি নাই বল্‌লেই হয়। সকল ধর্ম্মেরই এখানে স্থান আছে। ষিন্তোধর্ম্মের আদর্শ মহান্, অন্যান্য অনেক ধর্ম্মের মত সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর নয়।

কেবল যখন ধর্ম্মপ্রচারের নামে বিদেশাগত প্রচারকেরা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে সাম্রাজ্যের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হয়েচেন, তখনই জাপান অপরাধীকে শাস্তি দিয়াছে। জাপানের ইতিহাস পাঠক সকলেই জানেন, যদিও সাম্রাজ্যের বিপদাশঙ্কা হলে জাপানের তরবারি মুহূর্ত্তে ঝলসিয়া উঠে, তথাপি কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য কাহারও প্রতি বিশেষ কোন অত্যাচার হয় নাই। অনেকেই এ ধর্ম্মকে নানারূপে অঙ্কিত করেচেন।

* ল্যাফ্‌কাডিও হার্ন্‌।

মঠবাসিনী।

কোন কোন পাশ্চাত্য "পণ্ডিত" ইহা লইয়া হাস্য পরিহাস করেচেন, কেহ বা ইহা ধর্ম্ম পদবাচ্যই হতে পারে না ব'লে নিজ সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন!

এ ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হচ্চে প্রকৃতি পূজা ও মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান। জাপানীদের মত সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতিকে স্বদেশপ্রীতি ও দেশভক্তিতে দীক্ষিত

কর্‌তে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর হতে পারে না। পর্য্যটক জাপানে ভ্রমণ কর্‌বার সময় মধ্যে মধ্যে একটি ফটক দেখ্‌তে পাবেন। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত, প্রস্তরনির্ম্মিত, স্থান বিশেষে ধাতুনির্ম্মিত; কিন্তু গঠন প্রণালী সর্ব্বত্রই সমান। দুইটি স্তম্ভ পরস্পরের দিকে ঈষৎ হেলিয়া দণ্ডায়মান। একটি কড়ি উভয়স্তম্ভের উপর দিয়া দুই ধারে অল্প বিস্তৃত। এই কড়ির নিম্নে আর একটি কড়ি দণ্ডায়মান স্তম্ভ দুইটিকে যোগ করেচে, কিন্তু স্তম্ভ ছাড়িয়ে বিস্তৃত নয়। পর্ব্বতের সরুপথের সম্মুখে; প্রস্রবণের ধারে বা নিবিড় বন মধ্যে; কখন বা নির্জ্জন পাহাড়ের গায়ে বা সাগরের ধারে, যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মনে শান্তিবহন করে আনে, ও পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,—এমন একটি ফটক্ দেখ্‌বেন। এইরূপ ফটকের নাম "তোরি।"

এই ফটকের মধ্য দিয়া গিয়া অনেক সময় দেখ্‌বেন, একটি ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের মধ্যে গিয়া দেখুন কিছুই নাই। যেন কোন জীবন্ত দেবতার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রকৃতির মধুর স্তব্ধতার মধ্যে এ মন্দির দণ্ডায়মান! চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের নামে এ মন্দির উৎসর্গীকৃত! কখন বা ফটকের মধ্য দিয়া গিয়া দেখ্‌বেন মন্দিরও নাই, কিছুই নাই। কিছুই নাই বলি কেন! হয়ত ফটকের মধ্য দিয়া এমন এক জায়গায় আস্‌বেন, যেখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে, বিস্তৃত পাহাড়-প্রস্রবণ বা সাগরের ঊর্ম্মিমালায়, শস্যপূর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র বা অনন্ত নীলাকাশে, জাপানের উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রতিফলিত হতে দেখ্‌বেন। ইহাই ত জাপানীর ধর্ম্মের সত্যকার মন্দির, যেখানে দাঁড়িয়ে সে তাহার জন্মভূমির অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে পারে; যেখান হতে অসীম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জন বা প্রস্রবণের

"তোরি।"
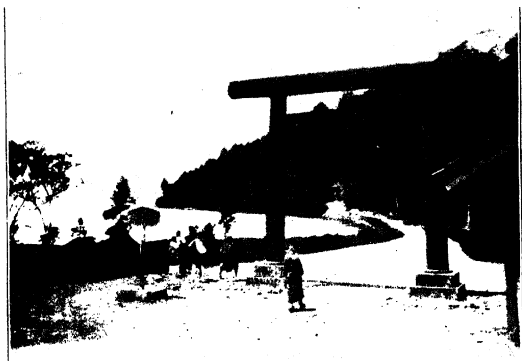
মৃদুতান, জাপানের স্তুতিগানের মত কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করে ; শস্যশ্যামল ক্ষেত্র জাপ-লক্ষ্মীর মঙ্গলহস্ত প্রদর্শন করে ; যেখানে দাঁড়ালে, স্বদেশের কনককিরণোদ্ভাসিত মাতৃমূর্ত্তি দর্শকের চিত্তে মহাদেবীর মত উত্থিত হয়ে দেবীপদে তার ক্ষুদ্র প্রাণ পুষ্পের মত অঞ্জলি দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। আর সাগরচুম্বিত, শতবিহগকাকলী মুখরিত, বনোপবনশোভিত পর্ব্বতমালাবেষ্টিত এই রম্য ভূভাগ, সে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

দেশের প্রতি ভালবাসায় জাপানীরা সব এক। স্বদেশের গৌরব ও সম্মান, সকলের এক মাত্র ভাবনা ; এবং এ ভাবনা যা হতে উদ্ভূত তাহাই জাপানের প্রকৃত ও এক মাত্র ধর্ম্ম।

অনেকের বিশ্বাস, যা কিছু কুসংস্কার সে সমস্তই ভারতবর্ষের মধ্যে

আবদ্ধ। এ ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি কোথা হতে তা বলা দুঃসাধ্য; তবে একটা প্রধান কারণ বোধ হয় বৈদেশিকেরা অহরহ আমাদের কাণের কাছে এই কথা ব'লে থাকেন। মনোবিজ্ঞানের একটা নিয়ম হচ্চে যে, একটা কথা কারো কাছে অনেকবার বল্‌লে অবশেষে সে তা বিশ্বাস করে ফেলে। আমাদের অবস্থাও তাই; আমরা যখন স্বদেশের বিষয়েই অজ্ঞ তখন আমরা জগতের বিষয়ে যে বিশেষরূপে অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি! তারপর বৈদেশিকদের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে, আমাদের দেশ কুসংস্কারে ভরা, এ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কুসংস্কার যে আমাদের দেশে নাই সে কথা বল্‌চিনে; তাহা যথেষ্ট আছে। কিন্তু জগতের অন্যান্য দেশে সর্ব্বত্রই কুসংস্কার একরূপে বা অন্যরূপে বর্ত্তমান; জাপানেও অন্যথা নয়।

ইতিপূর্ব্বে রমণীর মস্তকের যে সুন্দর কেশের প্রশংসা করেচি, তা নাকি কিছু কাল আগে ঈর্ষ্যার তাড়নায় বিষধরী ফণিনীতে পরিণত হত! প্রাচীন জাপানে (৩০-৪০ বৎসর আগে) ধনী লোকেরা এক বাটীতেই তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের সহিত "মেকাকে" অর্থাৎ উপপত্নী রাখ্‌ত। (আজ কাল এক বাটীতে রাখে না বটে, তবে—) দিবাভাগে কর্ত্তার ভয়ে বিবাহিতা পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে বাহিরে একতা থাক্‌লেও, রাত্রি-কালে তাদের গুপ্ত ঈর্ষ্যা জাগরিত হয়ে মস্তকের কেশের রূপান্তর ঘটাত। উভয়ের দীর্ঘ কেশ উন্মুক্ত হয়ে, ফণিনীর মত হিস্ হিস্ শব্দ করে, উভয়কে ধ্বংস করতে উদ্যত হত। এমন কি নিদ্রিতা রমণীদের দর্পণও প্রাণ প্রাপ্ত হয়ে পরস্পরের গাত্রে আঘাত করত! পুরাতন জাপানী প্রবাদ আছে, দর্পণ স্ত্রীলোকের আত্মা।

কথিত আছে খাতো সায়েমোন ষিঙেঞ্জি রাত্রে তার পরিণীতা ও রক্ষিতা স্ত্রীর কেশ বিষধর সর্পে পরিণত হয়ে ঘোর গর্জ্জনে উভয়ে উভয়কে ধ্বংস করতে উদ্যত দেখে, তার নিজের দোষে এ দুটি স্ত্রীলোকের মধ্যে গভীর ঈর্ষ্যার সৃষ্টি হয়েচে মনে করে অনুতপ্ত চিত্তে মস্তক মুণ্ডন করে একটি বৌদ্ধ মঠের পুরোহিত হয়ে যান।

জাপানী ভূতেদের দীর্ঘ মুক্তকেশ; এলোমেলো ভাবে মুখের উপর ছড়ান। তাদের পদদ্বয় নাই এবং তারা অসম্ভব রকম লম্বা। মনে করবেন না আমি ভূত দেখেচি; তবে জাপানী ভূতের ছবি দেখেচি। জাপানী জীবন্ত অবস্থায় অতি থর্ব্বকায়; সেজন্য এক হিসাবে জাপানী ভূত জীবন্ত জাপানীর চেয়ে উন্নত! "উইলো" গাছে ভূতের বাসা; এবং এই গাছের তলায়, রাত্রিকালে, তারা তাদের এলোমেলো চুল গাছের ঝালরের (ঝুরির) সঙ্গে মিশিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে। এখানে বেল গাছ নেই এবং সেই জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মদৈত্য নেই! আমাদের দেশে ভূতের মধ্যেও জাতিবিভাগ! জাপানী ভূতের মধ্যে জাতি বিভাগ নেই, কিন্তু আমাদের দেশে জীবিত মানুষের মধ্যে জাতিবিভাগ পুরো মাত্রায় বিদ্যমান! তবে কি আমরা জাপানী ভূতের চেয়েও অধম! জাতিবিভাগটা আমাদের দেশ থেকে শীঘ্র উঠিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে আর ভূতের কাছেও মান থাকে না!

হানেদা নামক স্থানে "ইনারি" বা চাউল-দেবীর একটি মন্দির আছে। দেবী নাকি ভবিষ্যৎ জানেন, বর্ত্তমান ত জানেনই; এবং বুদ্ধিমান্ শিয়াল নাকি তাঁর অনুরক্ত ভৃত্য। এই শিয়ালই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা ব'লে থাকেন! জাপানে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে শিয়াল ইচ্ছানুসারে

মনুষ্যের আকার ধারণ করে মানব সমাজে মিশ্‌তে পারে, এবং এইরূপে স্বভাবতই সে মানব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করে; এবং ইচ্ছা কর্‌লে অনেক খবর দিতে পারে। লোকে ব্যবসার লাভালাভ, কথন কথন বা বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা জান্‌তে আসে।

এইরূপ লোক রাত্রে মঠে বাস কর্‌লে রাত্রিকালে যে সব লোক পূজা কর্‌তে আসে তাদের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পায়। জনসাধারণের বিশ্বাস, এই সব পূজক মনুষ্যের আকার ধারণ কর্‌লেও প্রকৃত পক্ষে শিয়াল, তাদের কর্ত্রীর সেবা কর্‌তে আসে; এবং এই সময়ে তারা যে সব কথা বলে, তা দুঃস্থ হৃদয়ের অনুশোচনা নয়, পরন্তু ভবিষ্যদ্বাণী: সে জন্য ভবিষ্যৎজিজ্ঞাসুকে একথা গুলি মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তে হবে, কারণ তার ভবিষ্যতের সহিত এ কথাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে! পরদিন প্রাতে "কান্নুষি" বা প্রধান পুরোহিত তার কথাগুলি শুনে তার একটা অর্থ ব'লে দেন।

"কান্নুষি" সাধারণ লোককে মনগড়া অর্থে কেমন পরিতুষ্ট করে, এবং মিথ্যা কথা দ্বারা কেমন প্রতারণা করে, তা আর্থার লয়েড্‌ প্রণীত "এভ্‌রি ডে জেপ্যান" নামক পুস্তকে বর্ণিত নিম্নলিখিত ঘটনা পাঠে অনুমিত হবে।

জনৈক চাউল ব্যবসায়ী ব্যবসায়তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যবসায় পরিত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা করে। এরূপ কর্‌বার আগে চাউলদেবীর মন্দিরে গিয়া ভবিষ্যৎটা নিশ্চিতরূপে জেনে আস্‌বার ইচ্ছা হয়। "কান্নুষি"র সঙ্গে বন্দোবস্ত হলে রাত্রিকালে তাকে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। তখন শীতকাল, এবং শৈত্যাধিক্য হেতু শিয়ালেরা গর্ত্ত থেকে বোধ

হয় বার না হওয়াতে, তাকে অনেকক্ষণ বসে থাক্‌তে হয়। অবশেষে "গেতা"র শব্দ শ্রুত হ'ল এবং সে বুঝ্‌তে পারল দুজন লোক আস্‌চে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে শুনতে লাগ্‌ল। মনুষ্যরূপী শিয়ালেরা মঠের নিকটে আসিল, ঘণ্টা বাজিয়ে দিল, হাততালি দিল (সকল জাপানীই মন্দিরে এসে বোধ হয় দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য হাতে তালি দেন।) কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ হয়ে প্রার্থনা করে তাদের মধ্যে একজন বলিল : "তাকাএদা কতদূর হবে ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল "বেশী দূর নয়"।

"তবে চল সেখানে গিয়ে রাত্রি যাপন করা যাক।"

পরদিন প্রভাতে "কান্নুষি"র নিকট চাউল ব্যবসায়ী এই কথাগুলি বিবৃত করিল।

কান্নুষি বলিল, "আ! একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাকাএদা কতদূর' কেমন ?"

"আজ্ঞে হাঁ। এবং উত্তর হয়েছিল 'বেশী দূর নয়'।"

"হুঁ! তারা কোন্ দিকে গেল লক্ষ্য করেছিলে কি ?"

"হাঁ। বামদিকে।"

"বেশ! বামদিকে ফল শুভ, শুভচিহ্ন। এবং তারা তাকাএদার দূরত্ব জিজ্ঞাসা করেছিল। তাকাএদা মানে উঁচু ডাল, অর্থাৎ তোমার ভাগ্য উঁচু দিকে উঠ্‌বে। এবং বলেছিল "বেশী দূর নয়", অর্থাৎ তোমার ভাগ্য অচিরাৎ উন্নত হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্চে তুমি কৃতকার্য্য হবে। যাও ওসাকা ফিরে গিয়ে আবার চালের ব্যবসায় আরম্ভ কর।

ওসাকা ফিরে ব্যবসায় আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু "উঁচু ডাল"টি ভাঙা

দেখা গেল এবং সে জন্য তার পতন হতে বিলম্ব হ'ল না। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ব্যবসায় পরিত্যাগ করতে হ'ল।

কুসংস্কারের তাড়নায় মানুষ কি ভীষণ কাজ করতে পারে তা নিম্ন-লিখিত সত্য ঘটনা হতে প্রতীয়মান হবে। ১৯০৯ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের খবরের কাগজে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

য়্যাসু তার উপপতির সাহায্যে স্বামীকে হত্যা করে। কেন? সে বিশ্বাস করত পূর্ব্বজন্মে সে একটি সুন্দরী "গেইষা" ছিল, এবং অনেক পুরুষই তার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ছিল। জনৈক ভূস্বামী তার প্রেমে পড়ে এবং তাকে কিনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে তাকে পছন্দ না করলেও এ প্রস্তাবে অসম্মত হতে পারল না। এমন সময় এক বীর পুরুষ তাকে উদ্ধার করতে এলেন। তিনি বললেন যাকে সে পছন্দ করে না তার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না। অনেক অর্থব্যয় করে তিনি মেয়েটিকে ভূস্বামীর হাত থেকে উদ্ধার করলেন। য়্যাসু ও বীরপুরুষের মধ্যে গভীর ভালবাসা হ'ল, এবং অবশেষে তারা বিবাহ করে সুখী হয়েছিল। য়্যাসুর বিশ্বাস তার পূর্ব্বজন্মের উদ্ধারকর্ত্তা বীর স্বামী বর্ত্তমান সময়ে তার উপপতি! আর তার স্বামী যাকে সে হত্যা করেচে; সে পূর্ব্বজন্মে তার ভৃত্য মাত্র ছিল। ঈশ্বর তাকে জানান যে যদি সে এই (পূর্ব্বজন্মের ভৃত্যের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকা রূপ) পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকে তা হলে ঈশ্বর তাকে মেরে ফেলবেন; শুধু তাই নয় তার পরিবারের সমস্ত লোককে যমলোকে পাঠিয়ে দেবেন! সেই হেতু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সে তার পূর্ব্বজন্মের ভৃত্যের অবতার ইহজন্মের স্বামীকে হত্যা করেচে!

জন্মের কথা লইয়া এ পরিচ্ছেদ আরম্ভ করেচি, এখন মৃত্যুর কথা কহিয়া ইহা শেষ কর্‌ব। যে লোক জন্মে দিন দিন বৰ্দ্ধিত হয়েচে, শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েচে, ও বিবাহ করে সংসার-সুখ ভোগ করেচে, অবশেষে তার মৃত্যু হ'ল। জীবন-উৎসবের শেষে মৃত্যুর যবনিকা পড়্‌ল।

যারা বৌদ্ধ, তাদের মৃতদেহ ভস্মীভূত করে ভস্মাবশেষ সমাহিত করা হয়। সিন্তোধর্ম্মাবলম্বীদের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মৃত ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়, যিনি ঠিক মৃতব্যক্তির পরে, তিনিই প্রধান শোককারী হন। এই আত্মীয় রমণী হলে আপাদ-মস্তক শ্বেত পরিচ্ছদ পরেন, মস্তকের কেশ মুক্ত রাখেন ও কেশের পশ্চাদ্ভাগ শাদা কাগজে বাঁধেন। তিনিই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট মৃত্যুর খবর পাঠান। আইন অনুসারে মৃত্যুর পর অন্তত ২৪ ঘণ্টা মৃতদেহ বাটীতে রেখে দিতে হবে, তৎপরে সমাহিত করা যেতে পারে। মৃতব্যক্তির সমাজে পদের উচ্চতা অনুসারে শব বেশী দিন বা অল্প সময় বাটীতে রাখা হয়। যে যত মাননীয় তার শব তত বেশী দিন বাটীতে রেখে দেওয়া হয়। ৫,৭ দিন, কখন কখন ১০ দিনও রাখা হয়। মৃত-দেহে শ্বেত পরিচ্ছদ পরাইয়া বিছানার উপর চিৎ করে শোয়ান হয়। শবের মুখ শাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়; আত্মীয় বা বন্ধু কেহ মুখ দেখ্‌তে চাইলে মুখের আবরণ খোলা হয়। মৃতদেহ যে ঘরে রাখা হয়, সে ঘরে একজন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, রাত্রেও সর্ব্বদা একজন জেগে বসে থাকেন। একজনের পক্ষে সমস্ত রাত্রি বসে থাকা কষ্টকর হলে দুই তিন জন মিলে গল্প গুজবে রাত কাটিয়ে দেন।

মৃত্যুর পর পঞ্চম দিনে মৃতদেহ কাষ্ঠনির্ম্মিত শবাধারে রাখা হয়।

ধনী লোকেরা বহুমূল্য কাষ্ঠে দুই তিনটি শবাধার প্রস্তুত করান। একটি বাক্সের ভিতর আর একটি বাক্স রাখা হয়, এবং সকলের ভিতরকার বাক্সের মধ্যে শব রক্ষিত হয়। সে সময়ে পুরোহিত নিম্নলিখিত প্রার্থনা

ষিন্তো পুরোহিত।
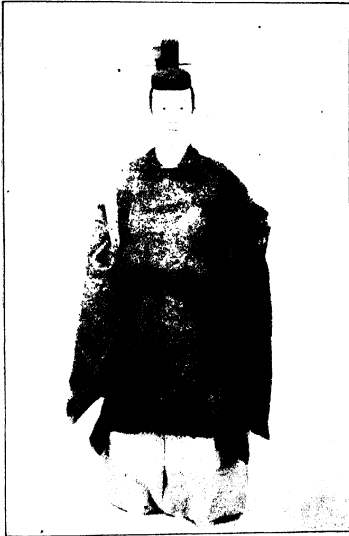
করেন; "আগেকার মত তোমার দেহ এখানেই, এই বাটীতে রাখ্‌তে ইচ্ছা হলেও দেশাচার অনুসারে তোমার দেহ দুঃখের সহিত অমুক স্থানে

সমাহিত করতে হবে।” শবাধারের কাছে একখানি দর্পণ রেখে পুরোহিত বলেন ; “তোমার দেহ অন্যত্র সমাহিত হলেও মনে রেখো তোমার আত্মা সর্ব্বদা এই বাটীতে উপস্থিত থাক্‌বে। এই পরিবারের মঙ্গল কামনা করতে কখনো বিস্মৃত হয়ো না।” পরিবারস্থ দেবতার মন্দিরে (কুলঙ্গিতে) এই দর্পণখানি রাখা হয় ও তার সঙ্গে মৃতব্যক্তির নাম লেখা একখানি কাষ্ঠখণ্ডও রাখা হয়। প্রতিদিন গোধূলির সময় ক্ষুদ্র প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়, আহারের সময় প্রথমে স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে আহার্য্য দ্রব্যাদি রাখা হয় ; এমন কি প্রাতে খবরের কাগজ এলে সেখানি সর্ব্বাগ্রে এখানে কিছুক্ষণ রেখে তৎপরে সকলে পড়েন। মৃতব্যক্তিকে দেখ্‌তে না পেলেও এঁরা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, ও জীবিতের অগ্রে মৃতের সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হয়ে নিজেদের ধর্ম্মভাব প্রতিপন্ন করেন।

জাপানী শব-যাত্রায় বেশী জাঁকজমক নাই। প্রথমে কয়েকটি লোক বাঁশের চারিধারে ফুল বেঁধে নিয়ে যায়। তারপর শবাধার কয়েকটি লোক পাল্কীর মত বয়ে নিয়ে যায়। তৎপরে একদল পুরোহিত ও সর্ব্বশেষে মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কেহ পদব্রজে কেহ বা রিক্‌সতে শবাধারের অনুগমন করেন। রমণীরা কখনো পদব্রজে যান না।

গোরস্থানে গভীর গর্ত্ত খোঁড়া হয়। গর্ত্তের তলদেশ ও পার্শ্ব ভাগ পাকা গাঁথুনি করে দেওয়া হয়। শবাধারের উপর একখানি প্রস্তরখণ্ডে মৃতব্যক্তির নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি লিখে রাখা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়া কোদালি দ্বারা প্রথমে গর্ত্তের ভিতর মাটি ফেলেন,
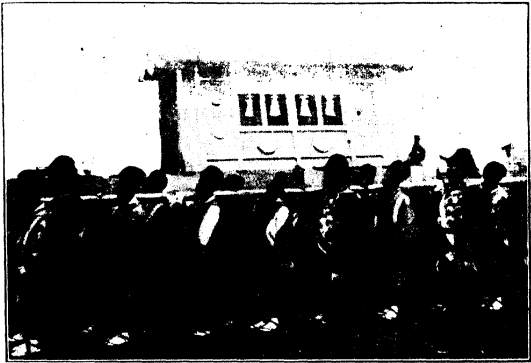
শব-যাত্রা।

তৎপরে অন্যান্য সকলে গর্ত্তটি মাটি দ্বারা ভর্ত্তি করে দেন। প্রথম এক বৎসর কবরের উপর একখানি কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করে রাখা হয়। তাতে মৃতের নাম, ধাম লেখা থাকে। মৃত্যুর পর এক বৎসর পূর্ণ হলে কাষ্ঠখানি উঠিয়ে ফেলে একখানি প্রস্তর ঐ স্থানে প্রোথিত হয়।

মৃতব্যক্তির বাটীতে প্রতি মাসে, যে দিন মৃত্যু হয়েছিল সেই দিন তাঁর উদ্দেশে পূজাদি হয়।

কয়েকটি কথা।

জাপানীদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর নয় বলে বোধ হয়। কারণ তারা বিষম দুর্গন্ধেও কখনো নাকে কাপড় দেয়না। চীনারাও নাকি এই রকম শুনেচি। এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলে বোধ হয় ঘ্রাণ শক্তি "নির্ব্বাণ" পেয়েচে!

এরা "বিষম" স্বদেশপ্রেমিক। স্বদেশের মঙ্গল ভাল উপায়ে না হয় ঘৃণিত উপায়েও কর্‌তে রাজি। দেশের অর্থ বাড়াবার জন্য বিদেশীর নিকট ব্যবসায়ীরা অসম্ভব রকম দাম আদায় করে নেয়। স্বদেশীর কাছে একদর, আর বিদেশীর নিকট সেই জিনিষেরই দ্বিগুণ দর। পাঠক পাঠিকা কি মনে করেন?

পুরুষের মধ্যে মদ্যপান ও তামাকু সেবন কে করেন না তা জানা দুঃসাধ্য; অর্থাৎ শতকরা ৯৯ জন চুরটও খান সুরাপানও করেন। মেয়েরা উৎসবাদিতে অল্প স্বল্প পান করে থাকেন। বৃদ্ধারা একরকম সরু লম্বা নলে ধূমপান করেন। অল্প একটু খানি তামাক ভরে এক টান দেন, তারপর নিকটস্থ 'হিবাচি'র ধারে দু চার আঘাত করে ছাই বার করে দেন। আবার ভরেন, আবার খান, এইপ্রকার। বৃদ্ধাদের দেখাদেখি কি না জানি না, অনেক যুবতীও মধ্যে মধ্যে ধূমপান করেন। নর্ত্তকী প্রভৃতি সিগ্‌রেট খায়। ছেলেরা গুরুজনের সঙ্গে একসঙ্গে পান করেন। গুরুজনের সাম্‌নে চুরট খাওয়া বা সুরাপান করা বে আদবি নয়। (যদিও মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উৎসবাদির সময় নিম্নশ্রেণীর লোকদের

রাস্তায় মাৎলামো করতে দেখা যায় কিন্তু মদ খেয়ে কাকেও খানায় পড়ে থাকতে দেখিনি।) সুরাপানই করুক আর যাই করুক, কেউ কখনো কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে না। জাপানীতে একটা কথা আছে, জীবন পালকের চেয়ে হাল্কা, আর কর্ত্তব্য পাহাড়ের চেয়ে ভারি।

আহারের সময়ে এরা য়ুরোপীয় প্রথা বিরুদ্ধ হুস্ হাস্ শব্দ করে; আমরা নিমন্ত্রণে গিয়ে ক্ষীর ও দধি ভোজনের সময় যেরূপ শব্দ করি। শুধু আহারের সময় নয়, আহারের পরও ঘণ্টা দুই এরূপ শব্দ শুনা যায়।

কেউ আলস্যে সময় না কাটালেও এরা সময়ের মূল্য বোঝেনা। কোন দোকানে কোন জিনিষের জন্য বায়না দিলে, প্রায়ই দোকানদার অঙ্গীকৃত দিনে জিনিষ সরবরাহ করে না। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলে: "দেরী হয়ে গেছে।" কোন সভা ২টায় আরম্ভ হবে বললে বুঝতে হবে, সভার কার্য্যারম্ভ ৩ টায় হতে পারে ৪ টায় ও হতে পারে। একবার এক জাপানী পরিবারে আমার ও অন্য একজন বাঙালী বন্ধুর আহারের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সন্ধ্যা ৭ টায় নিমন্ত্রণের সময়, আমরা ঠিক গিয়ে হাজির। শুনলুম আর দু জন জাপানী ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েচেন। বাটীর গৃহিণী অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে বসে রইলেন কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা আর আসেন না। অবশেষে প্রায় ৯ টার সময় গৃহিণী, বোধ হয় আমাদের দুরবস্থা দেখে, আমাদিগকে আহার করতে অনুমতি দিলেন। কিছুক্ষণ আহারের পর জাপানী নিমন্ত্রিতেরা এলেন, কিন্তু ঘরে ঢুকলেন না। ঘরের ধারে রকে বসে গৃহিণীর সঙ্গে নমস্কারাদি চলতে লাগল। সে কি শেষ হয়! গৃহিণী যত তাঁদের ঘরে ঢুকতে

বলেন, তাঁরা ততই তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু ঘরে ঢুক্‌বার নাম নেই। অবশেষে যদিও বা ঘরে ঢুক্‌লেন কিন্তু আসনে বস্‌তে চান না! অনেক সাধ্যসাধনার পর অল্প একটু আহার কর্‌লেন। তাঁদের রকম দেখে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এই যদি জাপানী আদবকায়দা হয় ত তার পায়ে নমস্কার!

জাপানী শিষ্টতা বিশ্ববিশ্রুত। তাদের আদব কায়দার অন্ত নেই। বিদেশীর সে সব শিখ্‌তে অনেক দিন লাগে। জাপানী নিজেকে ও নিজের সম্বন্ধীয় লোক বা জিনিষকে খুব নীচভাবে বর্ণনা করে; যথা: (বন্ধুদের মধ্যে ব্যবহৃত) আমি = "বোকু" = ভৃত্য; তুমি = "কিমি" = রাজপুত্র। আমার বাড়ী, "ময়লা", "ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র"; আর তোমার বাড়ী (কুটীর হলেও) "প্রাসাদ!" বাটীতে নিমন্ত্রিত আস্‌লে আহার দিয়া তাকে বলেন: কিছুই নেই, কেবল বিস্বাদ জিনিষ; আপনার বোধ হয় ভাল লাগ্‌বে না। ইংরাজ, নিমন্ত্রিতকে বলেন: এই মদ খেয়ে দেখুন, এ খুব ভাল, এমন টি আর কোথাও পাবেন না ইত্যাদি।

রাস্তার মাঝে দু জাপানীর দেখা হয়েচে, পুরুষ বা রমণী। উভয়েই দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে, হেঁট হয়ে, শরীরের উপরার্দ্ধ রাস্তার সহিত সামন্তর করে অভিবাদন কল্লেন। অভিবাদনের সময় শরীরের উপরার্দ্ধ ও অধোদেশ একটি সমকোণের সৃষ্টি করে। একজন বল্‌লেন "শরীর-গতিক ভাল ত?" আর একজন পুনর্ব্বার অভিবাদন করে বল্লেন "ধন্যবাদ, আপনি ভাল আছেন ত?" তখন প্রথম লোকটি বল্‌লেন "সেদিন বড় অভদ্রতা করেচি!" (একটু বুঝিয়ে বলা ভাল "অভদ্রতা" টি কি? প্রথম লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন

এবং খুব অভ্যর্থনা করেছিলেন। জিজ্ঞাস্য হতে পারে, আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সে ত ভাল কথা তাতে অভদ্রতা কোথায়? কিন্তু আদব কায়দা বড়ই নিগূঢ়। এরূপ স্থলে এরকমই বল্‌তে হয়। আমার ত মনে হয় কেউ যদি আমার প্রতি সর্ব্বদা এরূপ "অভদ্রতা" করে তা হলে বেঁচে যাই, জীবিকা উপার্জ্জনের চিন্তাতে ক্লিষ্ট হতে হয় না!) আবার অভিবাদন। দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন "না, না, ধন্যবাদ; সেদিন খুব ভোজ হয়েছে।" কারো বাটীতে গিয়ে অতি সামান্য কিছু আহার, এমন কি এক পেয়ালা "ওচা" পান করলেও বিদায়ের সময় অভ্যাগত বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণীকে বল্‌বে "খুব ভোজ খেলুম!"

অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার মাঝে দুই জাপানী ৫, ৭ মিনিট অনবরত অভিবাদন করচে ও প্রত্যেকবার অভিবাদনের আগে উপরিউক্ত প্রকারের গৎ আওড়াচ্চে। আমাদের দেশে একটা গল্প শুনা যায়, পশ্চিমাঞ্চলের দুই ভদ্রলোক পরস্পর পরস্পরকে "আপ্ উঠিয়ে, আপ্ উঠিয়ে" বল্‌তে বল্‌তে ট্রেণ ছেড়ে গেল। এখানেও ঘরের বাহিরে যাবার সময় সকলেই অন্যের পশ্চাতে যেতে চান। "আপনি আগে যান, আপনি আগে যান" বল্‌তে বল্‌তে অনেক সময় কেটে যায়। কেউ আগে যেতে রাজী নন। পাছে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ হয়!

এদেশের লোকের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাদের অনেক ছোট ছোট কাজে বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যখন একটি নূতন বাটী নির্ম্মিত, বা পুরাতন বাটী মেরামত হয়, তখন ভারার গায়ে মাদুর বা তক্তা লাগিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার উপর রাশীকৃত তক্তা, ইট বা চূণ সুরকী পথিকের চক্ষুকে পীড়ন করে না। রাস্তাথেকে ভিতরে কি হচ্চে কিছুই দেখা

যায় না। বাটী নির্ম্মিত হলে আবরণ খুলে দেওয়া হয়। তখন দেখেন কিছুদিন আগে যেখানে খোলা জমি পড়েছিল সেখানে সুন্দর বাড়ী দাঁড়িয়ে।

ছোট ছোট ছেলেরা ঘুড়ী উড়োয়, কখন কখন লাঠিম ঘুরোয়। অনেকে যুদ্ধের খেলা খেলে। দু' দল ছেলে কতকগুলো লাঠি নিয়ে একটা উচ্চভূমির কাছে যায়। একদল পাহাড়ের উপর থাকে, অন্য দল নীচে থেকে তাদের আক্রমণ করে। প্রথম যখন জাপানে আসি, তখন প্রায়ই দেখ্‌তুম একদল ছেলে আমাদের বাটীর পশ্চাতে পোর্ট্ আর্থারের যুদ্ধ অভিনয় কর্‌চে।

গ্রীষ্মকালে ছেলেদের প্রধান খেলা লম্বা কাঠির আগায় আঠা লাগিয়ে ঝিঁ ঝি পোকা ধ'রে বেড়ান। এই সময়ে অবিরাম "সেমি"র ডাক শুনা যায়। "সেমি" ধ'রে তাকে ছোট খাঁচায় পুরে রাখে। সকল দেশের ছেলে মেয়েরা জল ঘাঁট্‌তে ভাল বাসে। গ্রীষ্মকালে ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তার ধারে ড্রেন থেকে জাল্‌তি দিয়ে বেঙাচি ধরে।

বয়স গুনিবার প্রথা অদ্ভুত। ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে যে শিশুর জন্ম, তার পর দিন নববর্ষের পয়লা তার বয়স ২ বলা হয়।

দুই আর দুয়ে কত হয় তাও এরা মুখে মুখে হিসাব কর্‌তে পারে না। সব হিসাবই যন্ত্র সাহায্যে হয়। যন্ত্রটির নাম "সোরোবান"। সকল বাটীতে সকল লোকের কাছেই এক একটী থাকে।

"তাদাইমা" কথার অর্থ—অবিলম্বে, এই ক্ষণে। জাপানী হোটেলে ঝিকে ডাক্‌লে সে উত্তর দেবে "তাদাইমা", কিন্তু পনের মিনিট পরে আস্‌তে পারে, আধ ঘণ্টাও হতে পারে।

কৃষক-দম্পতী।

এরা হাতে তালি দিয়া ভৃত্যকে ডাকে। মন্দিরে প্রবেশ করে দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য হাতে তালি দেয়। তবে কি সাধারণ মানব ও দেবতায় কোন তফাৎ নাই?

মুষ্টিবদ্ধ হাত="পাথর;" বৃদ্ধাঙ্গুলির পরবর্ত্তী দুটি আঙুল খুলে রেখে অন্য আঙুল গুলি বন্ধ করলে হয় "কাঁচি"; হাত খানি খুলে রাখলে হয়—

"কাগজ"। কোন কিছুর নিষ্পত্তি কর্‌তে হলে দুজন সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে বল্‌বে জাং, কেন্‌, পো, ও সেই সঙ্গে উভয়েই হাত নাড়াবে। শেষ কথাটির সঙ্গে হাতে উপরোক্ত যাহোক্‌ একটা আকার কর্‌তে হবে। যদি একজনের হয়—"কাঁচি" ও অন্যের "কাগজ"—তবে যার "কাঁচি" তার জয়; কারণ কাঁচি কাগজ কাটে। "কাঁচি" ও "পাথর"এ পাথরের জয়; কারণ পাথর কাঁচি ভাঙে। "কাগজ" ও "পাথর"এ কাগজের জয় কারণ পাথর কাগজের দ্বারা আবৃত হতে পারে। উদাহরণ, কয়েকখানা রিক্‌স দাঁড়িয়ে আছে; আপনি ভাড়া কর্‌তে গেলেন। নিমেষ মধ্যে তাদের মধ্যে "জাং-কেন্‌-পো" হয়ে গেল। যে জিতিল সে আপনাকে নিয়ে যাবে। ঝগড়াবিবাদ কিছুই হবে না।

জাপানী পরিবারে সকলেই, পরিচারিকার সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করেন। কখনও একটি রূঢ় কথা বলেন না। এমন কি বাটীর গৃহিণী কখন কখন পরিচারিকাদের চুল বেঁধে দেন। সে জন্য পরিচারিকারাও সাধ্যমত কার্য্য করে। বিদেশীয় নবাগতের পক্ষে জাপানী পরিবারে কে বাটীর মেয়ে, কে পরিচারিকা তা বুঝে ওঠা কঠিন।

জাপানী ভাষায় গালাগালি নাই বল্লেও হয়। সর্ব্বাপেক্ষা কড়া কথা হ'ল "বাকা" অর্থাৎ বোকা।

বাটীর বাহিরে গেলে ধনী, দরিদ্র সকলেই, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অতি পরিষ্কার পোশাক্‌ পরেন।

সকল বিদেশীয়ের প্রতি জাপানীদের ব্যবহার অতি শিষ্ট। জাপানে য়ুরোপীয়ান ও আমেরিক্যানেরা ভারতবাসীদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন।

কুটীর ।

জাপানী বাড়ীতে এককালে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার রীতি নাই। অনেক লোক নিমন্ত্রিত হলে প্রায়ই হোটেল অথবা টী হাউসে খাওয়ান হয়ে থাকে। ভদ্র স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই "টী হাউস"এ যান না।

জাপানী পরিবারে ছেলে মেয়ে না থাকলে বাটী এত নিস্তব্ধ থাকে যে

বাটীতে লোক আছে ব'লে বোধ হয় না। তাঁরা খুব শান্তস্বরে কথাবার্ত্তা কহেন।

পুরাকালে জাপানীরা ভারতবর্ষকে "তেন্‌জিকু" বা "স্বর্গ" বলত। আজকাল বলে "ইন্দো"।

শিক্ষা।

"এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে যে নিরক্ষর পরিবার কোন গ্রামে থাকিবেনা ও কোন পরিবারে নিরক্ষর লোক থাকিবেনা"—জাপান-সম্রাটের এই মঙ্গলেচ্ছা সার্থক হয়েচে। বাস্তবিকই, অদ্যকার জাপানে নিরক্ষর পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি বিরল। শিক্ষা বল্‌তে কেউ যেন বুঝ্‌বেন না যে জাপানী স্ত্রী পুরুষ সকলের নামের পশ্চাতে যাকে ইংরাজিতে "ডিগ্রী" বলে তেমন পাঁচ সাতটা অক্ষর বসান আছে। এখানে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় এবং যা এদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল, তা ছাত্র বা ছাত্রীকে কেবল দু পাতা পড়্‌তে শিখান নয়; এই শিক্ষা তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে, দেশের এবং দশের যাতে কল্যাণ হয় তা কর্‌তে শিখায়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা দূর করে দেয়; দেশকে ভক্তি কর্‌তে, ভালবাস্‌তে শিখায়; দেশের যা কিছু সুন্দর ও বরেণ্য তাতে গৌরব অনুভব কর্‌তে শিখায়, যা দূষণীয়, বা যা দেশের অগ্রগতিকে বাধাপ্রদান করে, তাকে নির্ম্মমভাবে অবিলম্বে উৎপাটিত করায়।

মেইজির পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে বিদ্যাচর্চ্চা অতি সামান্য ছিল। যুবকেরা বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা অস্ত্রচর্চ্চার অধিক আদর করত। সাধারণ একজন "সামুরাই" বিদ্যাচর্চ্চাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌ত। যাদের শক্তি আছে তাদের অধ্যয়ন শোভা পায়না; বিদ্যাচর্চ্চা দুর্ব্বল, তরবারি ধারণে অক্ষম রাজসভাসদের উপযুক্ত! সাধারণ লোকে বিদ্যাচর্চ্চায় বিপদ্

ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেতনা! তখনকার দিনে বিদ্যালয় যে একেবারে ছিলনা তা নয়। প্রত্যেক ভূম্যধিকারীরই যেমন মল্লভূমি, তরবারি ক্রীড়ার স্থান প্রভৃতি ছিল, তেমনই যোদ্ধাদের ও সাধারণের জন্য বিদ্যালয়ও ছিল।

নব্য জাপানের শিক্ষাদান প্রণালী আমেরিকার আদর্শে গঠিত। সাধারণ ইস্কুল স্থাপনা করে শিক্ষা বিতরণ প্রণালী সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার ডেভিড্ মারে নামক এক আমেরিক্যান ভদ্রলোক, প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৫-১৮৯৭ পর্য্যন্ত ডাক্তার মারে এদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শদাতা ছিলেন।

ছেলে মেয়েরা ৬-৭ বৎসর বয়স হলে ইস্কুলে যায়। তার পূর্ব্বে তাহাদিগকে বাটীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাতা শিশু পুত্র-কন্যার বিদ্যা-লাভে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তা'দিগকে তুলি ধ'রে লিখ্‌তে শিখান হয়, ও সঙ্গীতের সাহায্যে সহরের ও পৃথিবীর সাধারণ ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি ট্রামগাড়ীর গান আছে। সে গানে ট্রামগাড়ী যেখানে যেখানে থামে সেখানকার, ও সেখানকার দর্শনীয় পদার্থ সমূহের উল্লেখ আছে। শিশুরা গান কণ্ঠস্থ করে সহরের ভূগোল অনেকটা শিখে নেয়। আর একটি গানে য়োকোহামা থেকে জাহাজ য়ুরোপ যাবার সময় যে যে বন্দরে থামে, সেগুলির নাম, অবস্থান, জলবায়ু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বালক বালিকাকে অতি শিশুকালেই জাতীয় সঙ্গীত "কিমিগায়ো" গাইতে, ও জাতীয় পতাকা অঙ্কন করতে শেখান হয়। জাতীয়ত্বের ভাব শিশুদের মনে এইরূপে রোপিত হয়।

মাতার সঙ্গে শিশু যখন বেড়াতে বেরোয়, সে তখন শিশুসুলভ

স্বাভাবিক অনুসন্ধান-স্পৃহা বশত নূতন কিছু দেখ্‌লেই মাতাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করে। মাতাও যথাসাধ্য তার প্রশ্নের উত্তর দেন, শিশুকে "চুপ্ কর্, জালাতন কর্‌লি," ব'লে অঙ্কুরেই তার অনুসন্ধান-স্পৃহা বিনাশ করেন না। এইরূপে শিশু তার প্রাত্যহিক ভ্রমণের সময় মাতার নিকট অনেক শিক্ষালাভ করে।

জাপানী শিশুদের বিষমাকার চীনা অক্ষর লিখন প্রণালী শিখ্‌তে অনেক সময় নষ্ট হয়। চীনা অক্ষর যে কত হাজার আছে তার ইয়ত্তা নেই। যে যত বেশী অক্ষর শিখ্‌বে সে তত পণ্ডিত। সাধারণতঃ প্রত্যেক জাপানী ৩-৪ হাজার অক্ষর শেখে। এক একটী কথার জন্য এক একটি অক্ষর। যেমন "ঘোড়া" লিখ্‌তে একটি অক্ষর, "গরু" লিখ্‌তে একটি অক্ষর, "জুতা" লিখ্‌তে একটি, ইত্যাদি।

সরকার হইতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক্‌কেই বিতরণ করা হয়। অতি দীন দরিদ্রও এই শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা ৬—১৪ বৎসরের প্রত্যেক বালকবালিকা গ্রহণ করতে বাধ্য। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে সাধারণত ৩—৪ বৎসর লাগে, ও উচ্চ প্রাথমিক শিখিতে ২, ৩, বা ৪ বৎসর লাগে। সাধারণ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীতি, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের অবস্থান অনুসারে কখন কখন অঙ্কন, সঙ্গীত বা কোনরূপ হস্তের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদিগকে, উপরিউক্ত বিষয়ের সঙ্গে কখন কখন সেলাই শেখান হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীতি, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত, জাপানী-

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের ইহার উপরে সেলাই শিখ্‌তে হয়। যারা উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেবল দুই বৎসরের জন্য প্রবেশ করে, তাদের সঙ্গীত ও বিজ্ঞান পাঠ হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। যারা তিন বৎসরের অধিককালের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে বালিকাদিগকে সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে হস্তের কার্য্য, ও বালকদিগকে কোন হস্তের কার্য্য, ও কৃষি বা ব্যবসায় শিখ্‌তে হয়। চারি বৎসরের জন্য যারা প্রবেশ করে তাহাদিগকে ইংরাজি ভাষাও শেখান হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্রের দুর্ব্বল স্বাস্থ্য তাদের জন্য কয়েকটি বিষয় বাদ দেওয়া হয়।

১৯০৭-০৮ সালের গণনায় জাপানে ২৭,১২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উহাতে ছাত্র সংখ্যা ৫,৭১৩,৬৯৮ ও শিক্ষক ১২২,৬৩৮ ছিল। যে সব ছাত্র উচ্চ ইস্কুলে যাবার ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে মধ্য-ইস্কুলে ৫ বৎসর শিক্ষালাভ কর্‌তে হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা দুই বৎসর অধ্যয়ন করেচে তারাই মধ্য-ইস্কুলে প্রবেশ কর্‌বার যোগ্য বিবেচিত হয়। প্রতি বৎসর মধ্য-ইস্কুলে প্রবেশলাভেচ্ছু বহু ছাত্র থাকাতে পরীক্ষা করে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হয়। এই ইস্কুলে নীতি, জাপানী ও চীনা ভাষা, ইংরাজি, ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত, প্রাকৃত বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, দেশ শাসনপ্রণালী ও রাষ্ট্রনৈতিক মিতাচার (Political Economy), অঙ্কন, সঙ্গীত, ব্যায়াম ও মিলিটারি ড্রিল্ শেখান হয়। উপরিউক্ত বিষয়গুলির মধ্যে দেশ শাসন প্রণালী ও সঙ্গীত প্রায়ই বাদ দেওয়া হয়। জাপানী ও চীনা ভাষা শিক্ষার জন্য যত সময় দেওয়া হয় ইংরাজি শিক্ষাতেও তত সময় ব্যয়িত হয়।

মধ্য ইস্কুলের সংখ্যা সমগ্র জাপানে ২৮৭, ছাত্র সংখ্যা ১১১,৪৩৬ ও শিক্ষক সংখ্যা ৫,৪৬২।

যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভেচ্ছু তাহাদিগকে ৩ বৎসর উচ্চ ইস্কুলে শিক্ষালাভ কর্‌তে হয়। প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র প্রবেশ কর্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করে ব'লে মধ্য-ইস্কুলের মত এখানেও পরীক্ষা করে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করা হয়। এই উচ্চ ইস্কুলের শিক্ষা ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দেয়। এই শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত। যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন বা সাহিত্য অধ্যয়ন করবে প্রথম বিভাগ তাদের জন্য। যারা ফার্ম্মাসি বা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিজ্ঞান বা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন কর্‌বে দ্বিতীয় বিভাগ তাদের জন্য। যারা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌বে তৃতীয় বিভাগ তাদের জন্য। প্রথম বিভাগে নীতি, উচ্চাঙ্গের জাপানী ও চীনা সাহিত্য, ইংরাজি, জর্ম্মান্ ও ফ্রেঞ্চের মধ্যে যে কোন দুটি, ইতিহাস, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞান, আইনের প্রথম মূল তত্ত্ব, মিতাচারের মূলতত্ত্ব (ছাত্রের ইচ্ছানুসারে) ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিভাগে নীতি, জাপানী ভাষা, ইংরাজি, জর্ম্মান্ বা ফ্রেঞ্চ্, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন (বক্তৃতা ও পরীক্ষা), ভূতত্ত্ব বিদ্যা ও ধাতু বিদ্যা, অঙ্কন ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। তৃতীয় বিভাগে নীতি, জাপানী ভাষা, জর্ম্মান্, ইংরাজি বা ফ্রেঞ্চ্, ল্যাটিন, গণিত, পদার্থবিদ্যা (বক্তৃতা ও পরীক্ষা:), রসায়ন (বক্তৃতা ও পরীক্ষা), প্রাণি-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (বক্তৃতা), প্রাণি-বিদ্যা (পরীক্ষা) ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঐ গণনায় জাপানে সর্ব্বসমেত ৭টি উচ্চ ইস্কুল, ছাত্র সংখ্যা ৪, ৮৮৮ ও শিক্ষক সংখ্যা ২৯১ ছিল।

মেয়েদের উচ্চ ইস্কুলে পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় ৪ বৎসর। স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় শিক্ষার জন্য ২ হতে ৪ বৎসর ব্যাপী পাঠের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। মেয়েরা জাপানী, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ধাতু, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত (Natural
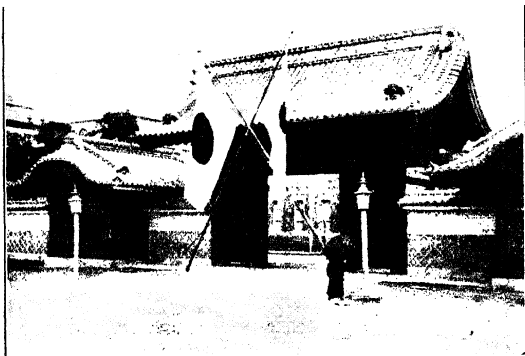
তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক্।

History), অঙ্কন, গৃহিণীপণা, সেলাই, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। ১৯০৭-৮ সালের গণনায় এরূপ ইস্কুল ১৩২টি ও ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৩৯, ৯১৭ ছিল।

জাপানে দুইটি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, একটি তোকিওতে ও

অপরটি কিয়োতোতে অবস্থিত। তোকিও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার ২০ বৎসর পরে কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি কলেজ আছে। আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি কলেজ। .তা ছাড়া জাপানের উত্তরে সাপ্পোরোতে একটি কৃষিকলেজ আছে, সম্প্রতি উহাও তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েচে।

আইন কলেজে আইন ও রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ কলেজে ৩০ জন অধ্যাপক আছেন। চিকিৎসা কলেজে চিকিৎসা, ও 'ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অফ্‌ ফার্ম্মাসি'তে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বা ফার্ম্মাসি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ দুইটি কলেজে সর্ব্বসমেত ২৮ জন অধ্যাপক। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নয়টি বিভাগে বিভক্ত। অধ্যাপক সংখ্যা ২৯। সাহিত্য কলেজে ২১ জন অধ্যাপক দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা দেন। বিজ্ঞান কলেজে ২২ জন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ৮টি বিষয় শিক্ষা দেন। কৃষি কলেজে ২৩ জন অধ্যাপক। এখানে কৃষি, কৃষি-রসায়ন, বন রক্ষণ প্রণালী ও পশু-চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্যোপযোগী কৃষক তৈয়ারি করবার জন্য ভিন্ন শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হলে, যারা উন্নত শিক্ষালাভেচ্ছু তাদের জন্য চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ও সাহিত্য কলেজে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পুস্তকাগার, হাঁস্‌পাতাল, ইতিহাস লিখন সভা, আদর্শ উদ্ভিদ্‌ উদ্যান (বটানিক্যাল গার্ডেন), ভূকম্পন নিরূপণ মন্দির, ও সামুদ্রিক দ্রব্য পরীক্ষা মন্দির বিশ্ববিদ্যালয়ে সংলগ্ন।

রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত তোকিওতে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য

বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রথমটির নাম কেয়ো, দ্বিতীয়টি ওয়াসেদা। কেয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৫ সালে স্থাপিত হয়। ইহার সম্পূর্ণ নাম "কেয়ো

য়ুকিচি ফুকুজাওয়া।

গিজুকু" বা "'কেয়ো' সময়ে স্থাপিত।" "মেইজি" বা ১৮৬৮ সালের পূর্ব্বে, ১৮৬৫-১৮৬৮ পর্য্যন্ত সময়কে 'কেয়ো' বলা হত।

এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ফুকুজাওয়া স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁর মত

মহাপুরুষ ও কর্ম্মী, জাপানে কেন জগতে দুর্লভ। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জাপানে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। তখনকার দিনের কুসংস্কার ও নানা অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও, অন্যান্য মহাপুরুষের মত স্বহস্তে ও স্বচেষ্টায় নিজের ভাগ্য গ'ড়ে তোলেন ও পশ্চাতে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে স্বর্গলাভ করেন।

ভীষণ অন্তর্বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ অন্তর্যুদ্ধের সময় জাপান সাম্রাজ্যের বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ থাকিলেও ফুকুজাওয়ার বিদ্যালয় একদিনের জন্যও বন্ধ হয় নি। এমন কি যে দিন তোকিওর উয়েনোতে অন্তর্যুদ্ধের শেষ যুদ্ধ হচ্ছিল সে দিনও তিনজন ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে শিক্ষালাভ করেছিল!

ফুকুজাওয়া কিউস্যু প্রদেশে সামুরাই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি কাষ্ঠপাদুকা নির্ম্মাণ করতে শিখেন। ছেলেবেলা থেকেই পুরাতন জাপানের সর্ব্ববিধ কুসংস্কার ও অসামঞ্জস্যের প্রতি তাঁর মনে ঘোর বিতৃষ্ণা জাগরিত হয়।

শিক্ষালাভার্থ তিনি ওসাকায় প্রেরিত হন। সেখানে তিনি গুণন বিদ্যা প্রভৃতি শিখেন। তাঁর পিতা, পুত্রের এই সব নূতন রকম বিদ্যা-লাভে ভীত হয়ে তাঁকে "বিপজ্জনক" বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে এক পুরোহিতের কাছে কন্‌ফুসাসের নীতি পাঠে আদেশ করেন। রাজা-রাজড়াকে যে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শিত হত ফুকুজাওয়া তা পছন্দ করতেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর ভূস্বামীর নাম লেখা একখণ্ড কাগজ পদদলিত করেন ও এই "বিষম" অপরাধের জন্য সেই ভূস্বামি কর্ত্তৃক শাস্তি পান। অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা গুরুতর বোধ হওয়াতে,

তিনি এই ঘটনা হতে জায়গিরদারদিগের অন্যায় ক্ষমতা পরিচালন এবং জায়গীর প্রণালীর অহিতকারিতা সম্যকৃরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি দেবতাদের অস্তিত্বের যথার্থতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছিলেন। একখণ্ড কাগজের উপর এক দেবতার নাম লিখে তা পদদলিত করেন। দেবতা কিন্তু তাঁকে কোন শাস্তি দিলেন না। তারপর একদিন মন্দিরে গিয়ে সেই দেবতার বিগ্রহটি সরাইয়া তাঁর জায়গায় একখণ্ড প্রস্তর রেখে আসেন। এবারেও দেবতা কোন শাস্তি দিলেন না। এ ঘটনা হতে দেবতাদের নিকট কোন ভয়ের কারণ নাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মানুষকে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করতে হবে, কর্ম্মী হতে হবে, কর্ম্মের দ্বারা স্ব স্ব অদৃষ্ট গড়ে তুলতে হবে। ফুকুজাওয়ার এই আত্ম-নির্ভরতা তাঁর সকল কৃতকার্য্যতার মূলে। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তাতেই কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয় যা প্রারম্ভে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য ছিল, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা সার্দ্ধ দুই সহস্র হয়েছিল। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। জাপানের অন্যান্য ইস্কুলে ইংরাজি ভাষা শিখান হলেও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ছেলেরা ৭।৮ বৎসর ইংরাজি পড়েও ইংরাজি লিখ্‌তে বা বল্‌তে পারে না। কেয়োর ছেলেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইংরাজি শিখে। তিন বৎসর আগে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কেয়োর বাৎসরিক উৎসব দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সেদিন বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। ছেলেরা সেদিন ইংরাজিতে অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতাদি করে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অনেকগুলি জাপানী বিষয় ইংরাজিতে তর্জ্জমা করে সেগুলি অভিনীত হয়। ইংরাজি উচ্চারণে ভুল থাক্‌লেও এমন আগা-

গোড়া ইংরাজি অভিনয় জাপানে আর কোথাও দেখি নি। যে মঞ্চের উপর অভিনয় হয়েছিল সেটিও ছেলেরা তৈরি করেছিল, দৃশ্যগুলি স্বহস্তে এঁকেছিল, এমন কি ঐক্যতান বাদনও ছেলেরাই করেছিল। একেই বলে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা!

ফুকুজাওয়াকে সংবাদপত্র চালনার পিতা বলা যেতে পারে। তিনিই প্রথমে "জিজি" সংবাদপত্র স্থাপনা করেন। আজ তাহা জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক। তিনি সম্মানের জন্য লালায়িত ছিলেন না, সেজন্য রাজদত্ত কুলীনের পদ (Peerage) প্রত্যাখ্যান করেন। খুব কম জাপানীই এরূপ করতে পেরেচেন। এক সময়ে সম্রাট্ তাঁর কার্য্যে প্রীত হয়ে কয়েক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন, তিনি নিজে তাহা না লইয়া ইস্কুলের চাঁদা স্বরূপ গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশে যেমন একজন উপার্জ্জন করে ও অন্য পাঁচজন তার উপর নির্ভর করে থাকে পুরাতন জাপানেও তদ্রূপ ছিল। ফুকুজাওয়া বুঝেছিলেন, যে পরের উপর নির্ভর করে থাকে তার উন্নতি অসম্ভব। এ জন্য "ক্ষুদ্র" জাপানের এই সব অহিতকর প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

কেয়োর ছেলেরা পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শী। প্রতি বৎসর কোন না কোন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়েরা নিমন্ত্রিত হয়ে খেলতে আসেন। "বেস্‌বল" আমেরিকার জাতীয় ক্রীড়া হলেও অল্প সময়ের মধ্যে কেয়োর ছেলেরা তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠেচে। এইরূপ দুইটি বিভিন্ন জাতির যুবকদের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে মিলন কেবল যে স্বাস্থ্যের হিসাবে ভাল এমন নয়; অন্য অনেক বিষয়েই

উভয়ের প্রভূত শিক্ষালাভ হয়। আমরা যতদিন কোন লোককে ভাল-রকম না জানি, ততদিন দূর হতে দেখে তার সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করে থাকি। অনেক সময় প্রকৃত তথ্য না জেনে লোককে অবজ্ঞা করতে শিখি। কিন্তু একবার মিলন হলে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়, ও পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করতে শিখি। এইরূপে জগতের অনেক অন্যায় দ্বেষ ও হিংসা দূরীভূত হতে পারে।

ফুকুজাওয়ার বিশেষ বন্ধু রাজনীতিবিৎ কাউণ্ট্ ওকুমা "ওয়াসেদা" নামক অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থাপয়িতা।

মেয়েদের ইংরাজি শিক্ষা কুমারী ৎস্নদার ইস্কুলে যেমন হয় এমন আর কোথাও হয় না। কুমারী ৎস্নদা জাপানী হলেও বাল্যকাল হতে আমেরিকায় থেকে মাতৃভাষা আমেরিকান স্বরে বলেন, আর তাঁর মত ইংরাজি ভাষা আর কোনও জাপানী রমণী বল্তে পারেন না। পুরুষের মধ্যে দুই এক জন বল্তে পারেন। মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া বা বিকৃতস্বরে বলা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় না হলেও, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কুমারী ৎস্নদা যে সম্পূর্ণ উপযুক্তা তাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁর ইস্কুলের শিক্ষাদান প্রণালী অন্যান্য ইস্কুল হতে বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

সমগ্র জাপানে মূক ও অন্ধবিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬টি। তন্মধ্যে একটি কেবল সরকারি। তোকিও মূক ও অন্ধ বিদ্যালয়ে ৩-৫ বৎসর পাঠের সময়। পাঠ্য বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ বিভাগ ও শিল্প বিভাগ। অন্ধদের সাধারণ বিভাগে জাপানীভাষা, পাটীগণিত, কথোপকথন প্রণালী ও ব্যায়াম ; ও শিল্প বিভাগে সঙ্গীত, বেদনা উপশম করবার জন্য
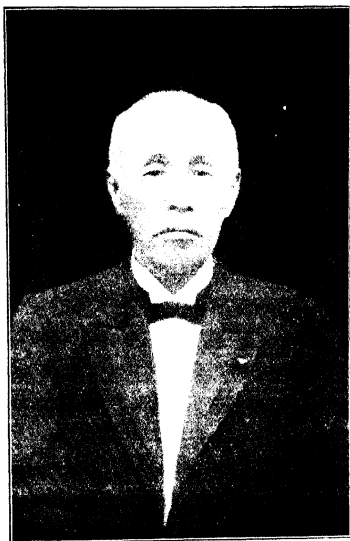
কাউণ্ট্ ষিঙেনোবু ওকুমা।

সূক্ষ্ম সূচী বেধন দ্বারা রক্ত নিঃসারণ, (acupuncture) ও গা, হাত পা টেপা (massage) শেখান হয়। বোবাদের সাধারণ বিভাগে পড়া, লেখা, রচনা, পাটীগণিত, লিখিত কথোপকথন, ও ব্যায়াম ; ও শিল্প বিভাগে অঙ্কন, খোদাই কার্য্য, ছুতারের কাজ ও সেলাই শেখান হয়।

ছেলেদের ভাষা শিক্ষার জন্য একটি সরকারি ইস্কুল আছে। এখানে কেবল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণত এখানকার ছাত্রেরা ব্যবসায়ী হয়ে বিদেশে গিয়া থাকে। নিম্নলিখিত দেশের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী, ফ্রান্স্, ইতালি, রুশিয়া, স্পেন, চীন ও কোরিয়া। গত দুই বৎসর হতে তামিল ও হিন্দুস্থানি ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হচ্চে। এতদিন পরে ভারতবর্ষের অর্থের উপর জাপানীর নজর পড়েচে, তাই এত আয়োজন। এই সব ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শেখাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইস্কুলের ক্ষুদ্র বস্‌বার ঘরে প্রত্যহ জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির প্রতিনিধি সমবেত হন। এই ইস্কুলে শিক্ষাকাল তিন বৎসর।

সুকুমার বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি ইস্কুল আছে। এখানে অঙ্কন, নক্‌সা, ভাস্কর বিদ্যা, স্থপতি বিদ্যা, ও শিল্প সম্বন্ধীয় সুকুমার বিদ্যা, এই পাঁচটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি শিক্ষার জন্য চারি বৎসর-কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে স্ত্রী, পুরুষ যার ইচ্ছা সে প্রবেশ কর্‌তে পারে। সাধারণত চারি বৎসরে শিক্ষা শেষ হয়।

১৮৭৭ সালে "পীয়ার্‌স্ স্কুল" স্থাপিত হয়। তখন কেবল রাজবংশীয় ও কাউন্ট্, ভায়কাউন্ট্, ব্যারণ প্রভৃতি কুলীন বংশীয় ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল। আজকাল প্রবেশাধিকার সকলেরই, তবে খরচ বেশী ব'লে সাধারণত ধনী লোকের সন্তানেরাই এখানে শিক্ষা লাভ করে।

১৯০৫-৬ সালের গণনা অনুসারে সমগ্র জাপানে ৩,০১৭টি শিল্প বিদ্যালয়, ও ছাত্র সংখ্যা ১৬০,৮৬২। ইহাদের মধ্যে তোকিও উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়টি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয় গুলিতে চীনা মাটির

বাসন প্রস্তুত প্রণালী, কাঁচ প্রস্তুত প্রণালী, কাপড় বোনা, ফলিত রসায়ন, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। কারখানাতেও শিল্পশিক্ষা করা যেতে পারে। জাপানী শিশু-শিল্প রক্ষা কর্বার জন্য জাপানী গভর্ণমেণ্ট বিদেশাগত পণ্যের উপর কর নির্দ্ধারণ করেচেন। বিদেশী তামাকের উপর শতকরা ১৫০ টাকা কর নির্দ্ধারিত আছে। সীলোন চা ও অন্যান্য বিদেশীয় আহার্য্য ও অপরাপর দ্রব্যাদির উপরও কর নির্দ্ধারিত আছে।

সর্ব্বসমেত ১০০টি পাঠাগার আছে, তন্মধ্যে কেবল একটি সরকারি।

সমস্ত ইস্কুলেই প্রাতে ৮টা হতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম হয়ে থাকে। দ্বিপ্রহরে একঘণ্টা (১২টা হতে ১টা পর্য্যন্ত) খাবার ছুটি। জাপানী ছেলে মেয়েরা সকলেই বাটী হতে খাবার, অর্থাৎ ভাত ও কয়েকখণ্ড মূলা বা মৎস্য, একটি ছোট বাক্সে ভ'রে নিয়ে যায়। পুস্তকাদি ও খাবারের বাক্স একখানি রঙিল কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যায়। এই রঙিল কাপড়ের নাম "ফুরোষিকি।" জাপানীরা কোন জিনিষই খুলে নিয়ে যান না, ফুরোষিকিতে জড়িয়ে নিয়ে যান।

প্রত্যেক ইস্কুলের ছেলে প্যাণ্টালুন ও গলাবদ্ধ কোট পরে। কোটের ধাতুনির্ম্মিত বোতামে ও টুপিতে ইস্কুলের বিশেষ চিহ্ন থাকে। তা দেখে কে কোন ইস্কুলে পড়ে তা বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা চৌকোণা টুপি পরে। মেয়েদের পোষাক সব ইস্কুলেই প্রায় এক রকমের। সাধারণ পোষাকের উপর কোমর থেকে একটা রঙিল ঘাঘরা পরে। এটির নাম "হাকামা।" ইস্কুলের মেয়েরা অনেকে জুতা পরে।

ইস্কুলের, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও বিদ্যালয়ে "নোট"

ইস্কুলের মেয়ে।

লেখ্‌বার জন্য হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে পাঠশালার ছেলেদের মত।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাঘ ও মেষশাবকের সম্বন্ধ নয়। তাঁদের মধ্যে যথার্থ প্রীতি ও সৌহৃদ্য বিদ্যমান। ইস্কুলে কোন ছাত্রকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয় না। শিক্ষকেরা অহরহ ছাত্রের কানের কাছে "তুই

মুখ্যু তোর কিছু হবে না” ব’লে তার নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেন না। কারো গাত্র স্পর্শ করা হয় না। বেত্রাঘাতে কেবল যে শরীরকে বেদনা দেওয়া হয় এমন নয়, আত্মসম্মানের উপর হাত দেওয়া হয়; ইহা এদেশের লোকেরা বোঝেন। শারীরিক শাস্তি দিয়া যাকে অপমান করা যায়, সে যে অপমানকারীকে সম্মান করতে শেখেনা, ঘৃণা করতেই শেখে এ কথা কজন লোকে বোঝেন! ভালবাসা দ্বারা ছাত্রকে বশ করতে হবে কানমলা বা বেত্রাঘাত দ্বারা নয়। কোন ছাত্র এখানে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করলে,—এরূপ ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প—শিক্ষক তাকে ভর্ৎসনা করেন। ইহাই যথেষ্ট শাস্তি! আমাদের সহস্র বেত্রাঘাতেও চৈতন্য হয় না। হবে কেন? ইস্কুলে শিক্ষকের হাতে, বাটীতে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের হাতে, রেলগাড়ীতে, ট্রামে, রাস্তাঘাটে—বিদেশীর কাছে অপমানিত হয়ে আত্মসম্মান জ্ঞান লোপ পায়। মানুষ এমন অবস্থায় পশুরও অধম।

উপরে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ইস্কুলের পাঠ্যতালিকা হতে দৃষ্ট হবে, যে জাপানে প্রত্যেক ইস্কুলেই ছোট বড় ছেলেমেয়েদের নীতি শিক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষা করতে হয়। প্রথমটিতে মানসিক উন্নতি হয়, ও দ্বিতীয়টিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। যার সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন তাকেই সম্পূর্ণ মানুষ বলা যেতে পারে।

ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণে বাহির হয়। এইরূপে তারা বাল্যকাল থেকে স্বদেশকে চিনতে শেখে, ও ইস্কুলের জীবন একঘেয়ে বোধ হয় না। বিভিন্ন প্রদেশাগত ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে, ও ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সৃষ্ট হয়।

সহরের বাহিরে নির্ম্মল বায়ু সেবন, ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ, স্বাস্থ্য ও মন উভয়েরই উন্নতি বিধান করে।

ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষা হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পড়াতে জাপানী পিতা গড়ে ৩০০০ ইয়েন বা প্রায় সাড়ে চারি সহস্র টাকা খরচ করেন। সেজন্য উচ্চ শিক্ষা পাওয়া অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

এমন অনেক জাপানী ছাত্র আছে, যারা স্বোপার্জ্জিত অর্থে লেখা-পড়া করে। কেহ কেহ খবরের কাগজে লেখে, কেহ বা রাত্রে ইংরাজি শিক্ষা দেয়। কেহ কেহ অন্য কার্য্যের অভাবে রিক্স টানে, দুধ বা খবরের কাগজ ফিরি করে। রাজধানীতে একটি সমিতি আছে, ছাত্রদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে, তা দরিদ্র ছাত্রদের কাজ জুটাইয়া দেয়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন কার্য্যই এরা হেয় মনে করে না। এরা বাগান ঝাঁট দেয়, জুতা পরিষ্কার করে, কাপড় কাচে, সংবাদ বহন করে বেড়ায়; সকল রকম কাজই করে।

তবে বিদেশী ছাত্রের পক্ষে জাপানে জীবিকা উপার্জ্জন করা বড়ই কঠিন, একরকম অসম্ভব। কারণ এদেশের লোকের মন আমেরিক্যান-দের মত প্রশস্ত হয় নি। যারা নীচ কাজ করে তা'দিগকে এরা সম্মানের চক্ষে দেখেন না। যাঁরা স্বোপার্জ্জিত অর্থে বিদ্যালাভ করতে চান তাঁদের আমেরিকা যাওয়াই প্রশস্ত।

আজকাল ফিলিপিনো, চীনা, ভারতীয়, কোরীয়, ও দু একজন রুশীয় ছাত্র জাপানে অধ্যয়ন কর্‌চেন। জাপানী ভাষাতে শিক্ষা দেওয়াতে ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে জাপানে শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য।

প্রায় ৩৫ বৎসর আগে যখন বিদেশী শিক্ষার নূতন প্রচলন হয়েছিল,

তখন ছাত্রেরা বিদেশের যা কিছু সব শিক্ষা করে "সভ্য" নামে পরিচিত হবার জন্য পাগল হয়েছিল। তথনকার দিনে ছাত্রেরা "রোণিন্" বা ভবঘুরে যোদ্ধাদের হাবভাব নকল কর্‌তে ভালবাস্‌ত।

আজকাল ইস্কুল ও কলেজে ছেলেরা অধ্যাপকের "নোট" ছাড়া বড় একটা পুস্তকাদি পড়ে না, এবং নিজের পাঠ্য বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয় অধ্যয়ন করে না। সেজন্য এদের চিত্ত অনেকটা সঙ্কীর্ণ থেকে যায় ও নূতন কিছু উদ্ভাবন কর্‌বার শক্তি জন্মে না। এরা নকল কর্‌তে খুব মজবুত; কিন্তু এই নকলে পারদর্শিতাই এদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে দিন দিন খর্ব্ব কর্‌চে। ইহা জাপানের পক্ষে শুভ নয়।

ব্যায়ামের মধ্যে তরবারি ক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ, য্যুযিৎস্যু ও তীর ছোড়া, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই করে থাকে। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য বড় বড় ইস্কুলে দাঁড় টানার ব্যবস্থা আছে। আজকাল পাশ্চাত্য ক্রীড়া সমূহ, বিশেষতঃ আমেরিক্যান "বেস্‌বল" প্রায় প্রত্যেক ইস্কুলেই প্রবর্ত্তিত হয়েচে।

প্রত্যেক জাপানী স্ত্রী পুরুষ একটু আধটু আঁক্‌তে পারেন। এঁদের হাতের লেখাও সাধারণত ভাল। এর কারণ বোধ হয় ছেলেবেলা থেকে তুলি দ্বারা লেখা। ইস্কুলের মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে ভাল ইংরাজি বল্‌তে পারেন। জাপানী পুরুষের একটি ত্রুটি এই যে এরা কোন বিদেশী ভাষাই ভাল করে বল্‌তে বা লিখ্‌তে পারেন না। অনেকে ২ বৎসর ইংরাজি পড়ে মনে করে ইংরাজি ভাষায় পণ্ডিত হয়ে গেছে, ও তাড়াতাড়ি ফ্রেঞ্চ্ বা জর্ম্মান্ পড়্‌তে আরম্ভ করে। ফলে সব ভাষাতেই সমান 'পণ্ডিত' হয়!

প্রত্যেক জাপানী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে ৭-৮ বৎসর ইংরাজি পড়ে আসে, অথচ ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জন ভাল ইংরাজি বল্‌তে বা লিখ্‌তে পারে না। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েচে তাঁরা ৭-৮ বৎসর ইংলণ্ড বা আমেরিকায় অবস্থান করেও সামান্য কথা ইংরাজিতে বল্‌তে পারেন না। কেনই বা পারবেন? মোটে ৭-৮ বৎসর আমেরিকা ছিলেন যে! একজন জাপানী অক্স্‌ফোর্ডের এম, এ (!) আছেন তিনি এক পাতা ইংরাজি লিখ্‌তে দশটা বানান ও ব্যাকরণ ভুল করেন। ইনি আবার একজন সংস্কৃত "স্কলার" (Scholar)! ইংরাজের মত ইংরাজি বল্‌তে বা লিখ্‌তে পারেন এমন জাপানীর সংখ্যা অতি অল্প।

আমার জনৈক বাঙালী বন্ধুকে তাঁর কারখানার এক জাপানী বন্ধু যে পত্র লিখেছিলেন নিম্নে তাহা আগাগোড়া উদ্ধৃত করে দিলুম। এখানে বলা ভাল, পত্রখানা "সাকুরা" ফুল ফুটবার কিছুদিন আগে লিখিত হয়েছিল। তখন আমার বাঙালী বন্ধুটি পীড়িত ছিলেন।

" 'Dear mukerji' Esq

"Sir,

many thanks for no writing you long time. I am much waiting for you to see the healthy face sir! The cherry blossoms like this picture will come soon to our sight. When the time come I shall be very glad to take a walk to such a fine place with you eachly hand to hand. So that quickly get rid of

your hately and lonely bed and come to our future flower garden.

Yours truly

T. Sato"

একটি জর্মান দুগ্ধের কৌটার উপরকার বিজ্ঞাপনের ইংরাজি কিছু উদ্ধৃত করে দিই :

"SUPREOR. CONDENSED. MIRLK .

"NEWREGISTUED. TRADE MARK.

"Condensed Mirk ofnu Manufacture Bearing Birb

"Mark has had gained ro Aidehi Seputation Ou

"Accounf of ifs ef clllanf and beltes gualitu Etan

* * * * *

"Accordinglu to guavd my own

"intere ef J have Altered my Trademark as Above

"giving lvery possible improvemeuf to its gualitu

"xereby etc etc.

* * * * *

"Sugar or Milk may appear, granulated or crystalized inlumps : it dissolves in water or not water. This proves the milk is pure"

সুশিক্ষা মনে উচ্চাভিলাষ জাগিয়ে তোলে। যার মনে উচ্চাভিলাষ নেই তার দ্বারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক জাপানী

বালক বালিকা, মনে মনে ভবিষ্যতে সে কি হবে তার ভাবনা ভাবে, ও সেরূপ হবার জন্য যত্নবান্ হয়। আমাদের প্রতিবেশী একটি বালককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি বড় হলে কি হবে? কানের কাছে মুখ এনে সে আস্তে আস্তে বলেছিল, "সেনাপতি!" বিখ্যাত প্রিন্স্ ইতোর সেক্রেটারির একটি ছোট ছেলেকে আমি এরূপ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল: "আমি সৈনিক হতে চাই না। প্রিন্স্ ইতোর মত হতে ইচ্ছা করি।" আমাদের দেশে লোকের মনে নানা কারণে উচ্চাভিলাষ জন্মিতে পারে না। ভবিষ্যৎ জীবনে উকীল, জজ হওয়া বড় জোর নামের আগে একটা "মাননীয়" বসানই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা! স্বাধীন ও পরাধীন জাতিতে এখানেই প্রভেদ।

পূর্ব্বেতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি।

খৃঃ পূঃ ৬৬০ সালের পূর্ব্বের জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সময় হতে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। জিম্মু এই বৎসরে জাপান আক্রমণ করেন ও জাপানের প্রথম সম্রাট হন। তখন জাপানে দুই প্রকার লোক ছিল। এমিষি নামক আদিম অসভ্যজাতি, ও কুমাসোজাতি। শেষোক্তেরা সম্ভবত কোরীয়দের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষে নবাগত আর্য্যেরা যেমন কতক পরিমাণে দ্রাবিড়ী ও অন্যান্য আদিম জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল সেইরূপ কুমাসোজাতি জাপানের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক মিশিয়া গিয়েছিল। জিম্মু ও তাহার অনুচরদের সহিত এমিষি ও কুমাসোর যুদ্ধাদি হয়। এ যুদ্ধে কুমাসো কোরীয়দের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, ও এই হতে জাপান ও কোরীয়ার বিবাদের সূত্রপাত। ১৯৩ খৃষ্টাব্দে জাপান সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো কোরীয়দের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। পরবর্ত্তী চারি শত বৎসরের মধ্যে জাপান হতে আরও চতুর্দ্দশটি অভিযান কোরিয়াতে প্রেরিত হয়। শেষ অভিযানটি সম্রাজ্ঞী কোক্যোকুর রাজত্বকালে ঘটে (৬৬০ খৃষ্টাব্দ)। জাপানের ইতিহাসের আরম্ভ কাল হতে কোরীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়েচে, ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়েচে; অবশেষে ছলে, বলে, কৌশলে আজিকার 'সভ্য' যুগে 'সুসভ্য' জাপান কোরীয়া গ্রাস করে জাপান সাম্রাজ্যের সীমানা বর্দ্ধিত করেচে। জাপান যখন বর্ব্বরতা ত্যাগ করে

সভ্যতার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিল, সেই পুরাতন যুগে কোরীয়া হতে সর্ব্ব-প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম ও চীনা অক্ষর জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু কালের এমনি মহিমা, শিক্ষাগুরু সভ্য দুর্ব্বল কোরীয়ের দেশ আত্মসাৎ করে জাপান ক্ষান্ত হয়নি, তাকে 'বর্ব্বর' আখ্যা প্রদান করেচে!

উৎপীড়িত, নির্জিত অর্দ্ধ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম শান্তির বার্ত্তা বহন করে এনেছিল। সাধারণ লোকেরা এ ধর্ম্ম গ্রহণ করলেও, উচ্চপদস্থ লোকেরা এ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট বাধা প্রদান করেছিল। যেহেতু বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্চ নীচের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেনা, সকলের সমানতা ও অভিন্নতা শিক্ষা দেয়। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মন্দির গুলি ধ্বংশ করা হয়েছিল, ও পুরোহিতেরা নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন।

সম্রাট্ কোতোকুর রাজত্বকাল, ৬৪৫খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, তাহাকে পুরাতন জাপানের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে অনেক সুসংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে সম্রাটের শাসনাধীনে আনা হয়।

কিছুকাল পরে সম্রাট্ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম নয়, তার বিকৃত ও কলুষিত রূপ। ক্রমে রাজসভা ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দুর্ব্বল ও মজ্জাশূন্য হয়ে পড়লেন। ৭০৭-৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্রাটেরা, হেইজো (নারা) নামক স্থানে বিলাসিতার স্রোতে ভেসেছিলেন। ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কানেমু রাজসভা কিয়োতোতে স্থানান্তরিত করে কিছুকালের জন্য এই উদ্দাম বিলাসিতার স্রোতঃকে বাধাদানে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐ সময়, অর্থাৎ ৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৬৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত সম্রাটেরা কিয়োতোতে বাস করেছিলেন। কিন্তু

"স্বভাব যায় না ম'লে," তাঁর পরবর্ত্তী সম্রাটেরা পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বিলাসী হয়ে উঠ্‌লেন। ৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সেইওয়া নামক সম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় হতে পরবর্ত্তী সহস্র বৎসর রাজশক্তি লোপ প্রাপ্ত হ'ল। বহুদিন ধ'রে ফুজিওয়ারা বংশ সম্রাটদের সহিত বাটীর মেয়েদের বিবাহ দিয়া প্রকৃত পক্ষে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্ষমতা করতলে রেখে দিয়েছিল। রাজারা রাজধর্ম্ম ভুলে গিয়ে অন্ধ বিলাসিতাকেই চরম ধর্ম্ম করে তুলেছিলেন। ফুজিওয়ারা বংশের আধিপত্য সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধপ্রিয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌লেন। রাজ্যশাসক ফুজিওয়ারা বংশের কালে পতন হলে যুদ্ধপ্রিয় তাইরা ও মিনামোতো গণের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল। এক শতাব্দীব্যাপী ভীষণ অন্তর্যুদ্ধে জাপানের অনেক বীর পুরুষ প্রাণ হারালেন, কত শত পরিবার অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়্‌লেন। অবশেষে য়োরিতোমোর নেতৃত্বাধীনে মিনামোতো গণের জয় হ'ল (১১৮৫)। যোরিতোমো সর্ব্বপ্রথম 'ষোগুন' বা 'যোদ্ধাশাসনকর্ত্তা—' উপাধি গ্রহণ করে, কামাকুরায় সভা স্থানান্তরিত করলেন, ও সম্রাটের নামে রাজ্যশাসন করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, রাজপরিবারের যেমন দুর্গতি হয়েছিল এই ষোগুনবংশেরও সেইরূপ দুর্গতি ঘটিল। য়োরিতোমোর অধঃপতিত সন্তানেরা শক্তিশালী হোজোবংশের প্রতিনিধির হস্তে দেশশাসনের সমস্ত অধিকার অর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। হোজোবংশীয় প্রতিনিধিরাই দেশের যথার্থ কর্ত্তা হয়ে উঠ্‌ল। ষোগুন ও সম্রাট্ উভয়েই ক্রীড়নকমাত্রে পর্য্যবসিত হলেন।

অতঃপর গো দাইগো নামক সম্রাট্ কিছুকালের জন্য নিজ প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত কর্‌লেও, অবশেষে পরাজিত হয়ে রাজধানী হতে পলায়ন কর্‌লেন। অন্য একজন সম্রাট্‌রূপে ঘোষিত হলেন ও পুনর্ব্বার ভীষণ অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পরে ষোগুন ইয়েয়াস্ সুবিখ্যাত সেকিগাহারার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর যুদ্ধ থেমে গেল। এই অন্তর্যুদ্ধের মাঝখানে ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিক পাদরিরা জাপানে পৌঁছিলেন। অনেক 'দাইম্যো' বিদেশী ব্যবসায়ীকে জাপানে এসে ব্যবসা কর্‌বার অনুমতি দেবার পক্ষে ছিলেন কিন্তু ষোগুন ইয়েয়াস্ ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন, তাই বিদেশীর সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর্‌তে কৃতসংকল্প হয়ে উঠ্‌লেন।

এধারে সেকিগাহারার যুদ্ধে পরাজিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসনকর্ত্তা ব্যারণেরা (দাইম্যোরা) ষোগুন তোকুগাওয়ার শাসনকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌তেন ও ষোগুনদের রাজত্ব ধ্বংশ কর্‌বার অবসর প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন। ষোগুন ইয়েয়াস্ ও ইয়েমিৎসু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও কনফ্যুসীয়দের মধ্যে মিলন করে খৃষ্টধর্ম্মকে বাধা দিবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নি। বৌদ্ধ ও কনফ্যুসীয়ের সহানুভূতি সিন্তোধর্ম্মের উপাসক রাজ-পরিবারের উপর ছিল।

এই সময়ে রাজপরিবারের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরা ইতিহাস পাঠে নিযুক্ত হলেন। তাঁরা রাজপরিবারের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করে ইতিহাস লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। জাপানী খৃষ্টানেরাও ষোগুনের আধিপত্য পছন্দ কর্‌তেন না।

ষোগুন ইয়েয়াস ভেবেছিলেন তিনি জাপানকে বহির্জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখে বহির্জগতের চিন্তাস্রোতঃকেও বাধাদানে সমর্থ হয়েচেন।

কিন্তু চিন্তা ত বাধাপ্রাপ্ত হবার নয়, নাগাসাকির ওলন্দাজদিগের ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর দিয়া য়ুরোপের চিন্তাস্রোতঃ জাপানে পৌঁছিতে লাগল।

ভিতরে ভিতরে এই কারণগুলি কার্য্য করছিল, এমন সময় ১৮৫৩ সালে মার্কিন কমোডোর পেরি রণপোত লইয়া জাপানের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করলেন। তৎকালীন ষোগুনের প্রধান সচিব ঈ কামোন নো কামি বিদেশীর প্রতি ঘৃণায় অন্যান্য জাপানী অপেক্ষা পশ্চাৎপদ না হলেও, জাপানের দৌর্ব্বল্য, ও সেইক্ষণে বিদেশীর সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার অক্ষমতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ মানসে ষোগুনকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে শাসনতন্ত্রের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কিয়োতোয় লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত রাজপরিবার জনসাধারণের কতখানি হৃদয় অধিকার করে বসেছিলেন তা ষোগুন-সচিব জানতেন না, এবং এই ভ্রান্তি তাঁর কালস্বরূপ হ'ল। তিনি বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রতিপন্ন হয়ে নিহত হলেন।

১৮৬২ সাল। তিন বৎসর আগে মার্কিন গভর্ণমেণ্টের দূত মিঃ হ্যারিসের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই কয় বৎসর 'বর্ব্বর' বিদেশীয় জাপানে অবস্থান করে জাপান কলঙ্কিত করচে! এবং যে সন্ধির বলে এ ব্যবস্থা হয়েচে সে সন্ধির সাক্ষরকারী ঈ কামোন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হয়ে অসম্মানের সমাধিতে নিহিত! সম্রাট্ ও তাঁর সভাসদেরা, দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশ লোক, এবং সামুরাই, সকলেই বিদেশীদের আগমনের বিরুদ্ধে ছিলেন। অপরদিকে নিরস্ত্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রাণভরে গোঁয়ার সামুরাইদিগকে ঘৃণা করত,

ও অর্থ আহরণে তাদের বিতৃষ্ণা ছিল না; তারা বিদেশী বাণিজ্য প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল।

যোগুন সরকার অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিদেশীর সহিত সন্ধি যাতে ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট রইলেন। গৃহশত্রুদিগকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রাখলেন। এধারে মার্কিনেরা নিত্য নব অধিকারের জন্য দাবী করছিল। সম্রাটের বাসস্থান কিয়োতোর অতি নিকটে অবস্থিত কোবে বন্দর উদ্ঘাটনের জন্য প্রার্থনা করছিল, ও এ প্রার্থনায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া ও হল্যাণ্ড যোগদান করেছিল। যোগুন সরকারের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু সমস্ত জাপান ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল।

ইত্যবসরে রুশিয়া জাপান সাম্রাজ্যের উত্তরে স্থাঘালিন দ্বীপের দক্ষিণার্দ্ধ গ্রাস করেচে, এবং রুশীয় রণপোত ৎসুসিমা দ্বীপ অধিকার করেছিল কিন্তু ইংরাজ রণপোতের আবির্ভাবে সত্বর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েচে। এই ৎসুসিমা দ্বীপের নিকটেই বিগত রুশো-জাপান যুদ্ধের সময় অ্যাড্‌মিরাল তোগো কর্ত্তৃক রুশীয় রণপোত সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়।

১৮৬২ সালে সর্ব্বপ্রথম জাপান হতে রাজদূতগণ রুশিয়াতে প্রেরিত হন। তাঁরা রুশিয়া গিয়া স্থাঘালিন সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার কথা পাড়েন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। সেই বৎসরেই তোকিওতে বড় বড় ব্যারণদের একটা বিরাট্ সভা আহূত হয়। যোগুনকে বিদেশীর সহিত সন্ধি ভঙ্গ করতে বাধ্য করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। ষিমাজু সাবুরো, সাৎসুমার নাবালক রাজপুত্রের অভিভাবক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ৎসুসিমা-বীর অ্যাড্মিরাল কাউন্ট্ তোগো।

হাকাতা নামক স্থানে ষিমাজু একদল রোণিনের * সাক্ষাত পান। তাদের নায়ক হিরানো জিরো এই সমস্ত গণ্ডগোলের একটা সত্য মীমাংসা

* ইহার প্রকৃত অর্থ, "ঢেউ-মানব ;" যে ঢেউয়ের মত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। ভদ্রসন্তান, যাদের অস্ত্রধারণ করবার অধিকার ছিল, কোনও কারণে, কুতকর্ম্মের জন্য, কার্য্য হতে জবাব পেয়ে, বা অদৃষ্টদোষে প্রভু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দ্দিষ্ট পেশা না থাকাতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত ; কখন কখন নূতন প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে, কখন বা

খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশে দুইটি পরস্পর স্বাধীন সরকারই সমস্ত গোলমালের কারণ, এবং যতদিন সম্রাট তাঁর পূর্ব্ব পদে, অর্থাৎ দেশের একমাত্র শাসনকর্ত্তারূপে অধিষ্ঠিত না হন, তত দিন দেশে শান্তি স্থাপিত হবে না। ষিমাজু হঠাৎ কিয়োতো আক্রমণ করে সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত দেশকে সম্রাটের নামে তাঁর চতুর্দ্দিকে সমবেত হতে আহ্বান করুন, ও পরে যোগুনকে বিতাড়িত করে যথার্থ সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে দেশে শান্তি স্থাপনা করুন, ইহাই হিরানো ষিমাজুকে বুঝিয়েছিলেন।

ষোগুন-সরকার চিন্তিত হয়ে উঠলেন। দেশের চতুর্দ্দিক হতে বড় বড় ব্যারণেরা তাঁদের সশস্ত্র অনুচরদিগের সহিত তোকিওর দিকে আসচেন। অনুচরদের সঙ্গে কারও বিবাদ বাঁধলে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা, সে জন্য ষোগুন যাতে তাঁরা কোন ক্রমে ব্যারণদের অনুচরদের বিরক্তি ভাজন না হন, কানাগাওয়ার বিদেশীদিগকে সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু তিনি যা ভয় করেছিলেন তাই ঘটল। একদল বিদেশী পুরুষ ও ও রমণী অশ্বারোহণে তোকাইদো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে সাৎসুমার রাজকুমারের দলের সহিত তাদের দেখা হ'ল। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে, বিদেশীয়দের, ঘোড়া থেকে নেমে যতক্ষণ না রাজপুত্র চলে যান ততক্ষণ হাঁটুগেড়ে বসা উচিত ছিল। তাঁরা কিন্তু এরূপ প্রথার কথা জানতেন না তাই অশ্বারোহণেই যেতে লাগলেন। এ

লুণ্ঠনবৃত্তি অবলম্বন করে দিনযাপন করত, তারা পুরাতন জাপানে 'রোণিন' নামে অভিহিত হত। কখন কখন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে, কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার আগে লোকে রোণিন হত, তাহাতে তার প্রভুকে সেই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য দুঃখভোগ করতে হত না।

দেখে রাজকুমারের সামুরাই অনুচরদের মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ল, দীর্ঘ তরবারি নিয়ে তারা বিদেশীর দলকে আক্রমণ করিল। মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হ'ল। মিঃ রিচার্ড্‌সন নামক ইংরাজ ভদ্রলোক দুর্ভাগ্যক্রমে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন ও নিহত হলেন। এই ঘটনা ব্যারণদের সভাভঙ্গের কারণ স্বরূপ হ'ল। ইংরাজ সরকার ক্ষতিপূরণস্বরূপ ষোগুনের নিকট হতে ১০০,০০০ পাউণ্ড্‌, এবং সাৎসুমার রাজকুমারের নিকট ২৫,০০০ পাউণ্ড্‌ দাবী করলেন। সাৎসুমা-রাজ ক্ষতিপূরণ করতে অস্বীকৃত হওয়াতে কাগোষিমাতে গোলা নিক্ষেপ করবার জন্য ইংরাজ রণপোত প্রেরিত হ'ল। (১৮৬৩)

রিচার্ড্‌সনের হত্যা ও কাগোষিমার উপর গোলাবর্ষণ 'রেষ্টোরেসন্‌' কিছুকালের জন্য পিছাইয়া দিল। এই সময়ে, কেমন করে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ইহাই সকলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠ্‌ল। ১৮৬৩ সালে কিয়োতোতে ব্যারণদের সভা পুনরাহূত হ'ল। এই সভায় স্থিরীকৃত হ'ল সম্রাট্‌ ও ষোগুন উভয়ে একযোগে দেশ হতে বিদেশীকে বিতাড়িত করবেন। ষোগুনের উপর এই জাতীয় মুক্তির দিন স্থির করবার ভার প্রদত্ত হ'ল। জাপানের ক্ষুদ্র শক্তি এ কার্য্য করতে অক্ষম তা ষোগুন জান্‌তেন, তাই তিনি নানা অছিলায় বিলম্ব করতে লাগ্‌লেন। সভায় স্থিরীকৃত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করবার ইচ্ছা যে ষোগুনের নাই, তা লোকের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না। এবং ফলস্বরূপ গোলমাল, হাঙ্গামা, বিদেশীর প্রতি অত্যাচার ও অপমান নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। তোকিওতে ইংরাজ ও আমেরিকান দূতনিবাস দগ্ধ হ'ল!

এদিকে কিয়োতো রাজপ্রাসাদে চোষু ও আইজু গণের লোকদের মধ্যে

বিবাদ হ'ল ও চোযুর লোকেরা পরাস্ত হয়ে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হ'ল। যোগুন ইহাদিগকে প্রাসাদ পাহারা দিবার জন্য রেখেছিলেন, উদ্দেশ্য, দুই দলকেই হাতে রাখা। উষ্ণ-মস্তিষ্ক চোযুর লোকেরা পরাস্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে নিজেদের দায়িত্বে বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, ও ষিমোনোসেকি প্রণালীর মধ্য দিয়া যাবার সময় বিদেশী জাহাজে গোলাবর্ষণ করিল। ইহার ফলে বিদেশীর সম্মিলিত যুদ্ধ জাহাজগুলি ষিমোনোসেকির উপর গোলাবর্ষণ করিল, ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ বহুমুদ্রা আদায় করে নিল। যোগুনও শান্তিভঙ্গ অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য চোযুতে অভিযান প্রেরণ করলেন।

ইতিপূর্ব্বেই চোযু হতে অনেক যুবক য়ুরোপে প্রেরিত হয়েছিল বা পলাইয়া গিয়াছিল। এই শেষ শ্রেণীর লোকেরা, ইতো, ইনোয়ে প্রভৃতি ষিমোনোসেকির গোলযোগের সময় ফিরিয়া আসিল। যে রাজদূতেরা য়ুরোপে প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁরাও ফিরলেন। সকলের মুখেই এক কথা :—জাপানের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন বিদেশী শক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। জাপান বৈষয়িক উন্নতিতে বিদেশী জাতিসমূহের বহু পশ্চাতে। আপাতত বিদেশী জাতিসমূহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই অবসরে বিদেশীর বিজ্ঞান ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহাদিগকে পারদর্শী হয়ে উঠ্তে হবে।

জনসাধারণ এ মত যে শীঘ্র গ্রহণ করেছিল তা নয়। ইনোয়ে (পরে মার্কুইস্ ইনোয়ে) উপরে লিখিত মত পোষণ কর্তেন ব'লে আততায়ীর হস্তে আহত হন, এবং বহুকষ্টে মরণের হাত থেকে রক্ষা পান। সেই কারণেই ইতোর (সুবিখ্যাত মৃত প্রিন্স্ ইতো) প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হয়,

প্রিন্স্ হিরোবুমি ইতো।

(জন্ম ১৮৪১, মৃত্যু ১৯০৯)

কিন্তু তিনি কোন পান্থশালার এক চাকরাণীর বুদ্ধিমতা ও অনুগ্রহে আততায়ীদের হস্ত হতে রক্ষা পান। আততায়ীরা একদিন তাঁকে হত্যা কর্‌বার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হয়। তিনি প্রাণভয়ে এক টী হাউসে প্রবেশ করেন। এক চাকরাণী সে সময় সেলাই কর্‌ছিল। সে

তাড়াতাড়ি আগুন রাখবার জন্য ঘরের মেঝে যেখানে কাটা থাকে তার মধ্যে ইতোকে প্রবেশ করিয়ে তার উপর লেপ ঢাকা দিয়ে বসে সেলাই করতে থাকে। এই রমণী পরে প্রিন্সেস্ ইতো হন ও অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেই ঐ কামোনের মতাবলম্বী হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে ১৮৬৬ সালে এক নূতন যোগুন শাসনকার্য্য হস্তে নিলেন, এবং পর বৎসর ১৮৬৭ সালে এক নূতন সম্রাট্ (বর্ত্তমান মিকাদো) সিংহাসনারোহণ করলেন। ঐ বৎসর ব্যারণদের এক মহাসভায় তোসা-রাজ, যোগুনের পদ বিলোপ করে সম্রাটের হস্তে যাবতীয় শাসন-শক্তি ন্যস্ত হউক, এই প্রস্তাব করলেন। যোগুনও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সমস্ত ক্ষমতা ১৮৬৭ সালের ১৯ নোভেম্বর তারিখে ত্যাগ করলেন। কিন্তু সম্রাটের হস্তে শাসনকার্য্য সমস্ত বুঝাইয়া দিবার জন্য আরও কিছু কাল যোগুন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাক্‌তে স্বীকৃত হলেন। এ দিকে চোযুর লোকেরা আইজুদিগের হস্তে পরাজয় কথা বিস্মৃত হয় নি। যোগুনের রাজত্ব ফুরিয়েচে মনে করে হঠাৎ কিয়োতো রাজপ্রাসাদে আইজুদিগকে আক্রমণ করে সেখান হতে তা'দিগকে বিতাড়িত করিল।

যোগুন এবং তাঁহার দলস্থ লোকেরা এই কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লেন। যোগুনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েচে ভেবে যোগুন তাঁর পদত্যাগ বাতিল করলেন ও নিজ অধিকার রক্ষা করবার জন্য অস্ত্রের আশ্রয় নিলেন। আবার অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। উভয় পক্ষই দুর্দ্দান্ত তেজে লড়্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা তখন জাপানের ইতিহাস নূতন করে গড়্‌বেন ভেবেচেন, পদে পদে যোগুন পক্ষ বিতাড়িত হতে

লাগ্‌ল, এবং অবশেষে তোকিওর উয়েনো উদ্যানে ভীষণ যুদ্ধের শেষে যবনিকা পাত হ'ল।

মার্ষ্যাল প্রিন্স্‌ ওয়ামা।

বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ব্যারণেরা এতাবৎকাল অধিকৃত জমি জমা ও সমস্ত ক্ষমতা সম্রাটের হস্তে অর্পণ কর্‌লেন, ও তাঁকেই দেশের একমাত্র অধীশ্বর রূপে বরণ করলেন। সম্রাট্‌ও দেশ শাসন কার্য্যে,

বিচার কার্য্যে, শিক্ষা বিতরণে ও দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন করলেন।

এইরূপে ১৮৬৮ সালে জাপানের একতা ও মিকাদোর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহুশতাব্দীব্যাপিনী অশান্তির মধ্য দিয়া দেশে শান্তির আবির্ভাব হয়েছিল। আজ জাপানের সর্ব্বাঙ্গীণ অদ্ভুত উন্নতিতে জগদ্‌বাসী স্তব্ধ ও বিস্মিত হয়েচে। পাশ্চাত্য জাতির মত ক্ষমতাবান্ হয়ে জাপান তাদের মধ্যে নিজ আসন পেতে নিয়েচে। য়ুরোপের বিজ্ঞানে ও য়ুরোপের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জাপান প্রথমে এক ভীষণ যুদ্ধে এসিয়ার বিপুল চীন সাম্রাজ্যের গর্ব্ব থর্ব্ব করে পুনরায় ১০ বৎসরের মধ্যেই প্রভূত বলশালী য়ুরোপের এক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃজাতিকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করেচে। কোরিয়ার ও মাঞ্চুরিয়ার তুষারাবৃত ক্ষেত্রে, পোর্ট্ আর্থারের দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মাঝে, জাপান-সমুদ্রের নীল জলের উপর, কামানের গর্জ্জন ধূমান্ধকারের মধ্যে, ভৈরব রবে জাপানের শক্তি ঘোষণা করেচে।

আজ ফর্ম্মোসা, স্যাঘালিন, পোর্ট্ আর্থার, কোরিয়া, সর্ব্বত্র জাপানের উদীয়মান সূর্য্যাঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় সমস্ত দেশের রাজধানীতে, সমস্ত বন্দরে জাপানের দূত-নিবাস। তার পণ্যভরা জাহাজ মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে দেশবিদেশে যাতায়াত করচে। তার কারখানায় রাত্রিদিন যা কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সব প্রস্তুত হচ্চে। দেশভরা বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ভরা ছেলে মেয়ে। হাজার হাজার লোক দেশ বিদেশে নিত্য নব বিদ্যান্বেষণে ছুটেচে। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ, বাণিজ্য জাহাজ, যাত্রী জাহাজ স্বদেশে তৈরি হচ্চে।

পোর্ট্ আর্থার বিজয়ী জেনারল্ কাউণ্ট্ নোগি।

এই উন্নতি কেবল ৪০ বৎসরে সাধিত হয়েচে। অপূর্ব্ব! এই উন্নতির মূলে সাধনা, প্রাণভরা সাধনা; প্রতিজ্ঞা, পাহাড়ের মত অটল, অচল প্রতিজ্ঞা; আর সর্ব্বোপরি আত্মত্যাগ। কত লোক প্রাণান্ত পরিশ্রম করেচে, দিনের পর দিন অপমানের বোঝা মাথা পেতে নিয়েচে; কত

শত সহস্র লোক অজানা দূর দেশে প্রাণত্যাগ করেচে, তাদের শ্বেতাস্থি পাহাড় মাঠ ছেয়ে ফেলেচে!

১৮৭৪ সালে প্রথম নিয়মতন্ত্র শাসনের জন্য আবেদন প্রেরিত হয়। কাউণ্ট্ সোয়েজিমা, গোতো ও ইতাগাকি তখন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরাই সরকারকে আবেদন করেন। সরকার কর্ত্তৃক আবেদন অসাময়িক ব'লে বিবেচিত হওয়াতে উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে আবেদনকারীরা পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করেন নি, সে জন্য তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন।

১৮৮১ সালের ১২ই অক্টোবর সম্রাট্ ঘোষণা করেন যে দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ সালে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হবে।

১৮৮২ সালে কাউণ্ট্ ওকুমা একটি দলের সৃষ্টি করেন উহার নাম "উন্নতিশীল।" তিনি তখন পররাষ্ট্র সচিবের পদে ছিলেন।

সম্রাটের ঘোষণা অনুসারে ১৮৯০ সালে সমস্ত দেশে নিয়মতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত হ'ল।

১৯০০ সালে প্রিন্স্ ইতো একটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের সৃষ্টি করেন।

১৯০৭ সালে কাউণ্ট্ ওকুমা 'উন্নতিশীল' দলের নেতার পদ পরিত্যাগ করেন। ইংলণ্ডের মত কমন্স্ মহাসভা ও লর্ড্স্ মহাসভা আইন কানুন তৈরি করেন, সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনাদি করে থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যেমন দেশ শাসনে সম্রাটের বিশেষ কোন হাত নাই, মহাসভায় দেশ প্রতিনিধিদের দ্বারা যেরূপ স্থিরীকৃত হয় সেইরূপেই সকল কাজ হয়ে থাকে, এখানে তার বিপরীত। সম্রাট্ দুই মহাসভারই নেতা। লর্ড্স্ মহাসভার একটি বিশেষ অধিকার ইহা ভঙ্গ করা যায় না।

কমন্স্ মহাসভার ৩৭৯ জন সভ্যের মধ্যে ৭৫ জন নগর সমূহ হতে, এবং অবশিষ্ট সভ্য গ্রামসমূহ হতে নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে।

২৫ বৎসরের অন্যূন বয়স্ক জাপানী পুরুষের মধ্যে যারা অন্যূন ১০ ইয়েন* বাৎসরিক কর দেয়, পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে তাহাদেরই ভোট দেবার ক্ষমতা আছে।

সতর হতে চল্লিশ বৎসর বয়সের প্রত্যেক জাপানী পুরুষ "জাতীয় সৈন্যদল" ভুক্ত, এবং প্রয়োজন হলে আইন অনুসারে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে বাধ্য।

জাপানীকে, ২০ বৎসর বয়স হলে ২-১ বৎসর সৈনিকরূপে কাজ করতে হয়। ধনিসন্তান বা দরিদ্রসন্তানে কোন বাচ বিচার নাই। শারীরিক অনুপযুক্ততা না থাকিলে প্রত্যেকেই সৈনিকের কাজ করতে বাধ্য। তবে ২০ বৎসর বয়সের সময় যদি কেহ ইস্কুল বা কলেজে অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন, তবে পাঠ শেষ হলে তাহাকে সৈনিকের কাজ করতে হয়। জাপানী সৈনিকের দেহের দৈর্ঘ্য অন্তত ৫ ফিট হওয়া দরকার।

সমাপ্ত।

---

* ১ ইয়েন আমাদের টাকায় প্রায় এক টাকা নয় আনা।